মাঝে মাঝে একে অন্যকে জোর গলায় ডাকছে ওরা। নিশীর বাপ জাইগা আছনি, ও নিশীর বাপরে কুই-কুই।

পশ্চিমে চর পড়েছে। বিস্তীর্ণ ভূমি জুড়ে কোনো লোকালয় নেই। শুধু বালু আর বালু। তার ওপরে আরো এগিয়ে গেলে সীমাহীন বুনো ঘাসের বন। দিনের বেলায় অসংখ্য গরু বাছুর নিয়ে রাখাল ছেলেরা আসে এখানে, রাতে নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে থাকে সমস্ত প্রান্তর। পুবে ফেলে আসা নদী এঁকে বেঁকে চলে গেছে শান্তির হাটের দিকে।

উত্তরে খাল। খালের পারে অসংখ্য বুনো ফুলের বন। একটু ভালো করে তাকালে ওপারে তৈরী লম্বা সাঁকোটা নজরে আসে এখান থেকে। চারপাশে এক পলক তাকিয়ে চুপ করে গেল টুনি।

ও মাঝি। মাঝি-ও-কু-ই। জেলে নৌকো থেকে কে যেন ডাকল, কোন হানের নাও, অ্যাঁ ?

গলা চড়িয়ে মন্তু জবার দিল, পরীর দিঘি।

জবাব শুনে চুপ করে গেল জেলেটা।

এতক্ষণ নৌকো বেয়ে আসছিল বলে শীতের মাত্রাটা বুঝে উঠতে পারেনি মন্তু। তাড়াতাড়ি ছইয়ের মধ্যে এসে ঢুকল সে।

টুনি নড়েচড়ে এক পাশে সরে গেল।

ছইয়ের সঙ্গে ঝোলান হুঁকো আর কল্কেটা নামিয়ে নিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে এক ছিলিম তামাক ধরিয়ে নিল মন্তু।

তারপর আবার বেরিয়ে এসে গলুইয়ের উপর আরাম করে বসে তামাক টানতে লাগল।

দক্ষিণ থেকে কনকনে বাতাস বইছে জোরে।

আকাশে মেঘ।

মেঘের ফাঁকে আধখানা চাঁদ মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে আবার মুখ লুকোচ্ছে তাড়াতাড়ি।

টুনি ডাকল, ওইহানে বইসা ক্যান, ভেতরে আহ।

মন্তু কোন জবাব দিল না। আপন মনে হুঁকো টানতে লাগল সে।

টুনি আবার ডাকল, আহ না, বাইরে ঠান্ডা লাগবো।

মন্তু নীরব।

আইবা না ? টুনির কণ্ঠে অভিমান।

বাইরে বেরিয়ে এসে ওর হাত থেকে হুঁকোটা নিল টুনি। চল, ভেতরে গিয়া শুইবা। এবার আর কোনো বাধা দিল না। নিঃশব্দে ছইয়ের ভেতর গিয়া শুয়ে পড়ল সে। ওর গায়ের উপর কাঁথাটা টেনে দিয়ে মাথার কাছে চুপচাপ বসে রইল টুনি।

বাইরে কনকনে বাতাস শূন্য প্রান্তরের উপর দিয়ে হু হু করে ছুটে চলেছে দূর থেকে দূরে। সেদিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরবে বসে রইল।

ভোরে ভোরে গ্রামে এসে পৌঁছাল ওরা।

মন্তু আর টুনি।

পরীর দিঘির পাড়ে তিনটে নতুন কবর।

দূর থেকে দেখে বুক কেঁপে উঠল তার। নিজের অজান্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, কে মরল ?

ঘোমটার নিচে থেকে টুনিও চোখ বড় বড় করে দেখছিল কবরগুলো। পথে আসতে মাঝি-বাড়ির কুদ্দুসের সঙ্গে দেখা হতে সব শুনলো মন্তু। প্রথম কবরটা এ গাঁয়ের তোরাব আলীর। আশির উপরে বয়স হয়েছিল ওর। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে চলাফেলা করতে পারত না। মরে বেঁচেছে বেচারা। নইলে আরো কষ্ট সহ্য করতে হত।

দ্বিতীয় কবরটা আসকর ফকিরের। পেটে পিলে হয়েছিল। প্রায়ই রক্তবমি করত। বুড়োরা বলত, শত্রু পক্ষ কেউ নিশ্চয় তাবিজ করেছে, নইলে অমন হবে কেন।

তার পাশের কবরটা হালিমার। আবুলের বউ হালিমা। গতকাল দুপুরে ঘরের মধ্যে হঠাৎ চিতল মাছের মতো তড়পাতে তড়পাতে মারা গেছে হালিমা।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল মন্তুর।

হালিমার মৃত্যুর সংবাদে কাঁদতে শুরু করেছে টুনি। ঘোমটার নিচে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। ইতস্তত করে মন্তু বলল, কান্দ

ক্যান, কাইন্দা কি অইবে।
বাড়ি ফিরে এলে বুড়ো মকবুল গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করল। একদিন নয়, দুদিন নয়, চার চারটে দিন।
দুশ্চিন্তায় বারবার ঘর-বার করেছে সে। আইতে এত দেরি অইলো ক্যান ? অ্যাঁ।
মন্তু খুলে বলল সব। কুটুম বাড়িতে গিয়ে কুটুম যদি আসতে না দেয় তাহলে কি করতে পারে সে ? তাছাড়া নদীতে যে জোয়ার-ভাটা আসে সেটাও কারো ইচ্ছেমতো চলে না। তাই আসতে দেরি হয়ে গেছে ওদের। মকবুল শুনলো সব, শুনে শান্ত হলো। তারপর কোদালটা হাতে তুলে নিয়ে বাড়ির উপরের খেতটার দিকে চলে গেল সে। যাবার পথে আমেনা আর ফাতেমাকে ডেকে গেল মকবুল। মাটি কুপিয়ে সমান করে মরিচের চারা লাগাতে হবে।

।। আট ।।

দেখতে না দেখতে হীরনের বিয়ের দিনটা ঘনিয়ে এল।
একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তাই আয়োজনের কোনো কার্পণ্য করেনি বুড়ো মকবুল। সাড়ে আট টাকা দাম দিয়ে একটা ছাগল কিনেছে সে। হাট থেকে চিকন চাল কিনে এনেছে আর আধ সের ঘি।
মিয়া বাড়ি থেকে কয়েকটা চিনেমাটির পেয়ালা আর বরতন ধার নিয়ে এল আমেনা। বরপক্ষের লোকদের মাটির বাসনে খেতে দিলে ফিরে গিয়ে হয়ত বদনাম করবে ওরা, তাই।
বুড়ো মকবুলের শরীরটা ভালো নেই। চারদিকে ছুটাছুটি করবে সে-শক্তি পাচ্ছে না সে। তাই বাড়ির অন্য সবার ওপরে বিভিন্ন কাজের ভার দিয়েছে। সুরত আলী, রশীদ, আবুল, মন্তু সবাই ব্যস্ত। বুড়ো শুধু দাওয়ায় একখানা পিঁড়ির উপর বসে তদারক করছে সব। খোঁজ-খবর নিচ্ছে। ভুঁইয়া বাড়ির গড়ের পাশে বড় মেহেদি গাছ থেকে মেহেদি তুলতে গেছে সালেহা আর ফকিরের মা।
আমেনা আর ফাতেমা, ঘরদোরগুলো লেপে মুছে ঠিক করে নিচ্ছে।
পুরো উঠোনটাকে ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে করে তুলেছে ওরা।
টুনি পুকুর ঘাটে বাসনপত্রগুলো মাজছে।
যার বিয়ে, সেই হীরন রসুই ঘরের দাওয়ায় চুপটি করে বসে রয়েছে আর অবাক হয়ে বারবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে সবার।
দুপুর রাতে পাড়াপড়শিরা অনেকে এল। কাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দল। দুখানা বড় বড় চাটাই বিছিয়ে নিয়ে, উঠোনে বসল ওরা। তারপর সবাই একসঙ্গে সুর করে গান ধরল–

মেহেদি তোমরা লাগ কোন কাজে।
আমরা লাগী দুলহা কইন্যারে সাজে।

ঢেঁকির উপরে তখন আম্বিয়াও গান ধরেছে। বিয়ের ধান ভানতে এসেছে সে। সন্ধ্যা থেকে ঢেঁকির ওপরে উঠেছে ও আর টুনি। তখন থেকে এক মুহূর্তের বিরাম নেই। উঠোনে মেয়েরা গান গাইছিল। তাদের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার জন্যে টুনি আর আম্বিয়া দুজনে গলা ছেড়ে গান ধরল।

ভাটুইরে না দিয়ো কলা
ভাটুইর হইবে লম্বা গলা।
সর্ব লইক্ষণ কাম চিক্কন পঞ্চ রঙের ভাটুইরে।

সহসা শব্দ করে হেসে উঠল বুড়ো মকবুল। ওর মনটা খুশিতে ভরে উঠেছে আজ। জোরে জোরে হুঁকো টানছে আর চারপাশে চেয়ে চেয়ে দেখছে সে।
হীরনকে মাঝখানে বসিয়ে ওর হাতে মেহেদি দিচ্ছে সবাই। মুখখানা নামিয়ে নিয়ে চুপ করে আছে মেয়েটা।
সুরতের ছেলেমেয়ে, কুদ্দুস, পুটি, বিন্তি ওরা হাতে মেহেদি দেবার জন্যে কাঁদাকাটি শুরু করে দিয়েছে। ওদের ধমকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল সালেহা।
মকবুল বলল, আহা তাড়াও ক্যান বউ। একটুখানি মেহেদি ওগোও দাও না।

হঠাৎ ফকিরের মা নাচতে শুরু করল। আঁচল দুলিয়ে, ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল সে।

কই গেলা সুরতের বিবি আমার কথা শোন।
আবের পাখা হাতে করি আউলাইয়া বাতাস কর।
ফুলের পাখা হাতে নিয়া জোরে বাতাস কর।

ওর নাচ দেখে ছেলে বুড়ো সবাই শব্দ করে হেসে উঠলো একসঙ্গে।
ধান ভানা বন্ধ করে টুনি আর আম্বিয়াও বাইরে বেরিয়ে এল।
আম্বিয়াকে আসতে দেখে নাচ থামিয়ে তার দিকে দৌড়ে এল ফকিরের মা, হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেল দলের মাঝখানে। তারপর ওকে লক্ষ্য করে ফকিরের মা গান ধরল।
দৌড়ে গিয়ে মন্তুর ঘরের মধ্যে ঢুকে দুয়ারে খিল দিল আম্বিয়া। সালেহা হেসে বলল, কিরে আম্বিয়া, এত ঘর থাকতে শেষে আমাগো মন্তু মিয়ার ঘরে ঢুইকা খিল দিলি।
মন্তু তখন উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে।
ওকে দেখে গ্রামের রসুর নানি তার ফোকলা দাঁত বের করে একগাল হেসে বলল, কি মিয়া ডুইবা ডুইবা পানি খাও। ঘরে গিয়া দেহ কইন্যা তোমার ঘরে গিয়া খিল দিছে।
মন্তু কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। হঠাৎ টুনির কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল সবাই।
তীব্র গলায় সে বলল, কি অইতাছে অ্যাঁ ? কি অইতাছে। কাম কাজ ফালাইয়া কি শুরু করছ তোমরা। অ্যাঁ ?
সহসা সবাই চুপ করে গেল। একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল ওরা। টুনি ততক্ষণে রসুই ঘরের দিকে চলে গেছে।
মন্তু নির্বাক।
দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে আম্বিয়া। তার চোখমুখ পাকা লঙ্কার মতো লাল। চিবুক আর গাল বেয়ে ঘাম ঝরছে ওর। কিছুক্ষণের জন্যে সবাই যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। একটু আগেকার সেই আনন্দ উচ্ছল পরিবেশটা আর এখন নেই। ফকিরের মা বিড়বিড় করে বলল, এমন কি কইরছি যে রাগ দেহান লাগছে। বিয়া বাড়ির মধ্যেই হৈ-চৈ না কইরা কি কান্দাকাটি করমু ? সালেহা বলল, আমরা না অয় মন্তু মিয়া আর আম্বিয়ারে নিয়া একটুখানি ঠাট্টা-মস্করা কইরতাছিলাম, তাতে টুনি বিবির এত জ্বলন লাগে ক্যান। ওর কথা শেষ না হতে ঝড়ের বেগে রসুই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল টুনি। কি কইলা অ্যাঁ, কি কইলা অ্যাঁ ? চুলগুলো বাতাসে উড়ছে ওর। চোখজোড়া জ্বলছে। সালেহা সঙ্গে সঙ্গে বলল, যা কইবার তা কইছি, তোমার এত পোড়া লাগে ক্যান। বলে মুখ ভ্যাংচাল সে।
পরক্ষণে একটা অবাক কাণ্ড করে বসল টুনি। সালেহার চুলের গোছাটা ধরে হ্যাঁচকা টানে ওকে মাটিতে ফেলে দিল সে। তারপর চোখেমুখে কয়েকটা এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মেরে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল টুনি। ঘটনার আকস্মিকতা কেটে যেতে চিৎকার করে কেঁদে উঠল সালেহা। মনে হল এ মুহূর্তে ওর মা মারা গেছে। কান্না শুনে এঘর ওঘর থেকে বেরিয়ে এল অনেকে।
মকবুল দাওয়া থেকে চিৎকার করে উঠল, কিরে কি অইলো অ্যাঁ। কি অইলো।
রশীদ, সুরত সবাই ছুটে এল সেখানে।
রশীদ বলল, কি কান্দবি না কইবি কিছু, কি অইছে ? সালেহা কোনো জবাব দিল না।
ফকিরের মা বুঝিয়ে বলল সব।
সালেহার কোনো দোষ নেই। আম্বিয়া আর মন্তুকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছিল ওরা। টুনি বেরিয়ে এসে হঠাৎ সালেহাকে মেরেছে।
মাইরছে। মাইরছে ক্যান ? রশীদ ক্ষেপে উঠল।
ওকে রাগতে দেখে আরো জোরে কান্না জুড়ে দিল সালেহা।
বুড়ো মকবুল বিব্রত বোধ করল। ইতস্তত করে বলল, মন্তু আর আম্বিয়া কই গেছে ? মন্তুকে ঘরের দাওয়াতে বসে থাকতে দেখা গেল। কিন্তু আম্বিয়াকে পাওয়া গেল না সেখানে। এই গন্ডগোলের মধ্যে নীরবে এখান থেকে সরে পড়েছে সে।
ফকিরের মা বলল, ওগো কোনো দোষ নাই।

কি ভেবে বুড়ো মকবুল একেবারে শান্ত হয়ে গেল। আস্তে করে বলল, তোমরা হৈ-চৈ কইরো না। বিয়ার সময় এইসব ভালো না। যা অইছে তার বিচার আমি করমু। খাঁটি বিচার করমু আমি। বলে দাওয়ার দিকে চলে গেল সে। তারপর হুঁকোটা হাতে তুলে নিয়ে আবার বলল, কই তোমরা চুপ কইরা রইলা ক্যান, গীত গাও, হ্যাঁ গীত গাও। ছেলে-বুড়োরা আবার হৈ-চৈ করে উঠল।

ফকিরের মা আবার গান ধরল।

এক বাটা পান এনে ওদের সামনে নামিয়ে রেখে গেল আমেনা। বলল, খাও। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরনো আবেশটা ফিরে এল আবার। ফকিরের মা নাচতে শুরু করল।

বিয়ের জন্যে কিনে আনা ছাগলটা ঘরের পেছনে ব্যাঁ-ব্যাঁ করে ডাকছে। চোখের কোণজোড়া পানিতে ভিজে উঠেছে ওর।

ভোর রাত পর্যন্ত কেউ ঘুমাল না।

তারপর একজন দুজন করে যে যার ঘরে চলে যেতে লাগল। মন্তু সবে তার ঝাঁপিটা বন্ধ করে দেবে এমন সময় বাইরে থেকে ধাক্কা দিল টুনি। ও কিছু বলার আগে ভেতরে এসে ঢুকল সে। পান খেয়ে ঠোঁটজোড়া লাল করে এসেছে। মুখে একটা প্রসন্ন হাসি, হাতে মেহেদি। সঙ্গে একটা মাটির বাটিতে করে আরো কিছু মেহেদি এনেছে সে।

বাটিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে টুনি আস্তে করে বলল, দেহি তোমার হাত দেহি।

মন্তু বলল, ক্যান ?

টুনি বলল, তোমারে মেহেদি দিমু।

মন্তু বলল, না।

টুনি বলল, না ক্যান, বলে ওর হাতটা টেনে নিল সে। মাটিতে বসে ধীরে ধীরে ওর হাতে মেহেদি পরিয়ে দিতে লাগল টুনি। মন্তু কোনো বাধা দিল না। নীরবে বসে শুধু তাকে লক্ষ করে মৃদু হাসল। কিছুক্ষণ পরে টুনি আবার বলল, আমার একটা কথা রাইখবা ?

কি ?

একডা বিয়া কর।

হুঁ।

দুজনে আবার চুপ করে গেল ওরা।

ওর দুহাতের তালুতে সুন্দর করে মেহেদি পরিয়ে দিতে দিতে টুনি আবার বলল, আরেকডা কথা রাইখবা ?

কি ?

আমার পছন্দ ছাড়া বিয়া কইরবা না।

হুঁ। একবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলো মন্তু। টুনি পরক্ষণে ওর হাতটা কোলের ওপরে টেনে নিয়ে ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, কথা দিলা ? বলে অদ্ভুতভাবে ওর দিকে তাকাল টুনি। মন্তু কি বলবে ভেবে পেল না। বার কয়েক ঢোক গিলল সে।

তারপর হঠাৎ করে বলল, শাপলা তুলতে যাইবা ?

মৃদু হেসে মাথা নাড়াল টুনি। না।

তাইলে চল, মাছ ধরি গিয়া।

টুনি আরো জোরে মাথা নাড়াল, না।

না ক্যান ? মন্তুর কণ্ঠে ধমকের সুর।

টুনি হেসে বলল, লোকে দেইখা ফেলাইলে কেলেঙ্কারি বাধাইবো। বলে উঠে দাঁড়াল সে। মন্তুকে কথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়ে পরক্ষণে সেখান থেকে চলে গেল টুনি।

বিয়ের পরে ক'টা দিন বাড়িটা একেবারে জনশূন্য মনে হল। ছেলে-বুড়ো প্রায় সবাই চলে গেছে হীরনের সঙ্গে তার শ্বশুর বাড়ি। শুধু যায়নি মকবুল আর মন্তু।

মকবুল যায়নি তার অসুখ বলে। প্রায়ই বিকেলে জ্বর আসছে ওর। সকালে একেবারে ভালো।

মন্তুরও শরীরটা ভালো নেই। বিয়ের দিন, রাতে বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লাগিয়েছে সে। বুড়ো মকবুল বলেছে, থাক, তোর

গিয়ে কাজ নেই। তুই পরে যাইছ। তাই থেকে গেছে সে।

বাড়ির মেয়েছেলেরা ক'দিন ধরে ঘুমুচ্ছে খুব। বিয়ের সময়ে দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি কেউ, তাই।

বুড়ো মকবুল সাবধান করে দিয়েছে ওদের, অমন করে ঘুমায়ো না তোমরা, চোর আইসা সর্বনাশ কইরা দিবো। আর আইলেই-বা কি নিবো। আছেই-বা কি। আমেনা শান্ত স্বরে জবাব দিয়েছে। ওর মনটা ভালো নেই।

একমাত্র মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে শান্তি পাচ্ছে না সে। বড় একা একা লাগছে। কে জানে স্বামীর বাড়ি গিয়ে কত কষ্টই না সহ্য করছে হীরন।

আজ সকাল থেকে মরাকান্না জুড়েছে ফকিরের মা। মৃত ছেলেটার কথা মনে পড়েছে ওর। বেঁচে থাকলে হয়তো সে এখন বিয়ের বয়সী হতো।

জ্বর নিয়েও বুড়ো মকবুল পুকুর পাড়ে বসে মরিচের গাছগুলোতে পানি দিচ্ছে। ফাতেমা দুবার এসে ডেকে গেছে ওকে, আপনের কি অইছে। এই রকম কাজ কইরলে তো দুই দিনে মরবেন আপনে।

কথাটা কানে নেয়নি মকবুল। একমনে পানি ঢালছে সে।

মন্তুকে পাঠিয়েছে গাঁয়ের কোবরেজ মশায়ের কাছে। লক্ষণ বলে ওষুধ নিয়ে আসার জন্য।

উঠোনে টুনিকে ডেকে তার হাতে ওষুধগুলো দিয়ে মন্তু বলল, কবিরাজ মশায় কইছে, এইগুলান ঠিকমত খাইতে।

টুনি ওষুধগুলো হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, কি অইবো ওষুধ খাইয়া, বুড়া মরুক। বলেই চারপাশে তাকাল টুনি, কেউ শুনল নাকি দেখল। মন্তু কোনো জবাব দিল না ওর কথায়। বেড়ার সঙ্গে ঝুলানো হুঁকো আর কল্কেটা নিয়ে রসুই ঘরের দিকে চলে গেল সে। একটু পরে এক বাটি তেঁতুল মরিচ মেখে এনে মন্তুর সামনে বসল টুনি।

অল্প একটু তেঁতুল মুখে পুরে দিয়ে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে তার স্বাদ গ্রহণ করতে করতে টুনি শুধাল, খাইবা ?

বাটিটার দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে মন্তু বলল, না। তারপর একমনে হুঁকো টানতে লাগল সে।

টুনি বলল, কবিরাজ কি কইছে ?

একরাশ ধুঁয়া ছেড়ে মন্তু জবাব দিল, কইছে, কিছু না, ভালো অইয়া যাইব।

ভালো অইয়া যাইবো ? চোখজোড়া কপালে তুলল টুনি।

নেড়ি কুকুরটা টুনিকে কিছু খেতে দেখে আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল। হঠাৎ দাওয়া থেকে পিঁড়ি তুলে ওর গায়ে ছুড়ে মারল টুনি।

সারাদিন কেবল পিছে পিছে ঘুরে, কোনহানে গিয়া একটু শান্তি নাই।

পিঁড়ির আঘাতে ঘেউ ঘেউ করে সেখান থেকে পালিয়ে গেল কুকুরটা।

।। নয় ।।

চৈত্র মাসের রোদে মাঠটা খা খা করছে।

যেদিকে তাকান যায় শুধু শুকনো মাটি। পাথরের চেয়েও শক্ত। আর অসংখ্য ফাটল। মাটি উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে ফেটে যায়। দাঁড়কাকগুলো তৃষ্ণায় সারাক্ষণ কা-কা করে উড়ে বেড়ায় এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে। বাড়ির আনাচে কানাচে। নদী নালাগুলোতে পানি থাকে না। মানুষ গরু ইচ্ছেমত পায়ে হেঁটে এপার-ওপার চলে যায়। পুকুরগুলোতে পানিও অনেক কমে আসে।

গরমে ঘরে থাকে না কেউ। গাছের নিচে চাটাই বিছিয়ে শুয়ে বসে দিন কাটায়। বাতাসে একটি পাতাও নড়ে না। সারাক্ষণ সবাই শুধু হা-হুতাশ করে। এমনি সময়ে হীরনকে দেখবার জন্যে ওর শ্বশুরবাড়িতে গেছে বুড়ো মকবুল। যাবার সময় একটা ন্যাকড়ার মধ্যে এককুড়ি মুরগির ডিম সঙ্গে নিয়ে গেছে সে। শূন্য হাতে বেয়াই বাড়ি গেলে হয়তো ওরা লজ্জা দিতে পারে তাই। পথে বামুন বাড়ির হাট থেকে চার আনার বাতাসাও কিনেছে সে। বাড়ির বাচ্চাদের হাতে দেবে।

ভর সন্ধ্যায় মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরে এল মকবুল। বার বাড়ি থেকে ওর ক্লান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সুরত ! সুরত ! ও মন্তু, কেউ কি নাই নাকি রে।

মন্তু গেছে মিয়া বাড়ি। গাছ কাটার চুক্তি নিয়েছে সে।

সুরতও সেখানে।
আবুল বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কি ভাই সাব, কি অইছে ?
টুনি আর আমেনাও বেরিয়ে এল বাইরে।
মকবুল বলল, সুরত, রশীদ ওরা কই ?
আমেনা বলল, সুরত কাজে গেছে, রশীদ গেছে হাটে, সালেহার লাইগা সাবু আনতে।
ওর জ্বর হইছে ভীষণ।
জ্বর নাহি, আহা কখন আইলো ? গায়ের ফতুয়াটা খুলতে খুলতে মকবুল বলল, বাপু তোমরা সক্কলে একটু সাবধানে থাইকো ! ও বিন্তির, বঁইচির মা শোনো, তোমরা একটু সাবধানে থাইকো।
গেরামে ওলা বিবি আইছে।
ইয়া আল্লা মাপ কইরা দাও ! আতঙ্কে সবাই শিউরে উঠল।
গনু মোল্লা ওজু করছিল, সেখান থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করল, কোন্‌হানে আইছে ওলা বিবি ? কোন্ বাড়িতে আইছে ?
মকবুল বলল মাঝি-বাড়ি।
মাঝি-বাড়ি ? এক সঙ্গে বলে উঠল সবাই। কয়জন পড়ছে ?
তিনজন।
তিনজন কে কে সে কথা বলতে পারবে না মকবুল, পথে আসার সময় ও বাড়ির আম্বিয়ার কাছ থেকে শুনে এসেছে সে।
বাড়ির সবাইকে আরেক প্রস্ত সাবধান করে দিল বুড়ো মকবুল, তোমরা সক্কলে একডু হুঁইসারে থাইকো বাপু। একডু দোয়া দরুদ পইড়ো। বলে খড়মটা তুলে নিয়ে ঘাটের দিকে চলে গেল সে।
ফকিরের মা বুড়ি এতক্ষণ নীরবে শুনছিল সব, এবার বিড়বিড় করে বলল, বড় খারাপ দিন-কাল আইছে বাপু। যেই বাড়িডার দিকে একবার নজর পড়ে সেই বাড়িডার এক্কেবারে শেষ কইরা ছাড়ে ওলা বিবি। বড় খারাপ দিন-কাল আইছে। বলে নিজের মৃত ছেলেটার জন্য কাঁদতে শুরু করল সে।
টুনি দাঁত মুখ শক্ত করে তেড়ে এল ওর দিকে, বুড়ি যহন তহন কান্দিছ না কইলাম। শিগ্‌গির থাম।
ধমক খেয়ে ফকিরের মা চুপ করে গেল। সেই বিয়ের সময় সালেহাকে মারার পর থেকে টুনিকে ভীষণ ভয় করে বুড়ি।
ইতোমধ্যে মন্তু আর সুরত ফিরে এসেছে।
কাঁধের ওপর থেকে কুড়ালটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে না রাখতে টুনি একপাশে টেনে নিয়ে গেল ওকে।
মাঝি-বাড়ি যাও নাই তো ?
মন্তু ঘাড় নাড়ল, না ক্যান কি অইছে ?
টুনি বলল, ওলা বিবি আইছে ওইহানে। বলতে গিয়ে মুখখানা শুকিয়ে গেল ওর।
মন্তুর দুচোখে বিস্ময়। বলল কার কাছ থাইকা শুনছ ?
ও কথার কোনো জবাব না দিয়ে টুনি আবার বলল, শোন, ওই বাড়ির দিকে গেলে কিন্তুক আমার মাথা খাও।
যাইও না ক্যান ?
মন্তু সায় দিয়ে মাথা নাড়ল কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারল না সে। আজ সকালে মিয়া-বাড়ি যাওয়ার পথে একবার করিম শেখের সঙ্গে দেখা করে গেছে মন্তু। নৌকাটাকে ভালোভাবে মেরামত করার বিষয় অনেকক্ষণ আলাপ করে গেছে ওর সঙ্গে। কিন্তু তখন তো এমন কিছু শুনেনি সে।
আম্বিয়ার সঙ্গেও দেখা হয়েছিল, সেও কিছু বলেনি।
উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে সাত পাঁচ ভাবল মন্তু। বুড়ো মকবুলকে তামাক সাজিয়ে দেবার জন্যে রসুই ঘরে গেছে টুনি। এই সুযোগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।
দিঘির পাড়ে নন্তু শেখের ভাইঝি জামাই তোরাবের সঙ্গে দেখা হল। পরনে লুঙ্গি আর কুর্তা। হাতে লাঠি। বগলে একজোড়া পুরনো জুতো। মন্তুকে দেখে প্রসন্ন হাসির সঙ্গে তোরাব প্রশ্ন করল, কি মিয়া খবর সব ভালো তো ? মন্তু নীরবে ঘাড় নাড়ল। তারপর জিজ্ঞেস করল, কই যাও, শ্বশুর বাড়ি বুঝি ?
হুঁ, তোরাব শ্বশুর বাড়িতেই যাচ্ছে। কাজকর্মের ফাঁকে অনেক দিন আসতে পারেনি, খোঁজ-খবর নিতে পারেনি। তাই সুযোগ পেয়ে একবার সকলকে দেখে যেতে এসেছে সে।

পকেট থেকে দুটি বিড়ি বের করে একটা মন্তুকে দিয়ে আরেকটা নিজে ধরাল সে। বিড়ি খেতে ইচ্ছা করছিল না ওর। তবু নিতে হল। সগন শেখের পুকুর পাড়ে এসে থামল তোরাব। জুতো জোড়া বগল থেকে নামিয়ে হাত-পা ধোয়ার জন্যে ঘাটে নেমে গেল সে।

বলল, একটুহানি দাঁড়ান মিয়া। অজু কইরা নি।

হাত-পা ধুয়ে জুতোজোড়া পরে আবার ওপরে উঠে এল তোরাব।

পকেট থেকে চিরুনি বের করে নিয়ে বলল, মাঝি-বাড়ির খবর জানেন নাহি, সক্কলে ভালো আছে তো ?

মন্তু বলল, ভালো তো আছিল, কিন্তুক একটু আগে শুনছি, ওলা লাগছে।

ওলা ? তোরাব যেন আঁতকে উঠল। পায়ের গতিটা কমিয়ে এনে সে শুধাল, কার কার লাগছে ?

মন্তু বলল, কি জানি ঠিক কইবার পারলাম না।

হুঁ। হঠাৎ থেমে গেল তোরাব। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল, তারপর পায়ের জুতোজোড়া খুলে আবার বগলে নিতে নিতে বলল, এই দুঃখের দিনে গিয়া ওনাগোরে কষ্ট দেয়নের কোনো মানি অয় না মিয়া, যাই, ফিইরা যাই। যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়াল সে। আস্তে করে বলল, আমি যে আইছিলাম এই কথাডা কেউরে কইয়েন না মিয়া। বলে মন্তুর উত্তরের অপেক্ষা না করে যে পথে এসেছিল সে পথে দ্রুতপায়ে আবার ফিরে চলল তোরাব। হাতের বিড়িটা অন্ধকারে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ওর চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মন্তু।

মাঝি-বাড়ি থেকে একটা করুণ বিলাপের সুর ভেসে এল সেই মুহূর্তে। একজন বুঝি মারা গেল। কলজেটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠল মন্তুর। মাঝি বাড়ির দেউড়িটা পেরিয়ে ভেতরে আসতে সারা দেহ কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। নন্তু শেখ মারা গেল। হাঁপানি জর্জর করিম শেখ মৃত বাবার দেহের পাশে বসে কাঁদছে। আম্বিয়া কাঁদছে তার বিছানায় শুয়ে। ওলা বিবি তাকেও ভর করেছে। তাই বিছানা ছেড়ে ওঠার শক্তি পাচ্ছে না মেয়েটা। সেখান থেকে কাঁদছে সে।

দাওয়ার ওপরে দাঁড়িয়ে রইল মন্তু।

মাঝি-বাড়ির ছমির শেখ ওকে দেখে দুহাতে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠল। এই কি মুছিবত আইলো মিয়া, আমরা বুঝি এইবার শেষ অইয়া যামু। ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল মন্তু। তারপর ওর কাছ থেকে বাকি খোঁজ-খবর নিলো সে। ছোট ভাই জমির শেখ কবিরাজ আনতে গেছে দুক্রোশ দূরে রতনপুরের হাটে। এখনো ফিরে আসেনি, ভোরের আগে যে আসবে তারও কোনো সম্ভাবনা নাই। এই একটু আগে ছমির শেখ, পরিবারের ছেলেমেয়ে সবাইকে তার মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। বুড়োরা মরে গেলেও ছেলেমেয়েগুলো যাতে বাঁচে। নইলে বাপ-দাদার ভিটার ওপর বাতি দিবার কেউ থাকবে না। ছমির শেখের দুগণ্ড বেয়ে পানি ঝরছে। তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজের চোখজোড়াও ভিজে এল ওর। আম্বিয়ার ঘরের দিকে তাকাতে দেখল, বিছানায় শুয়ে বিলাপ করছে মেয়েটা।

পরদিন ভোরে একটা খন্তা আর কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মন্তু।

পরীর দিঘির পাড়ে জায়গাটা আগেই দেখিয়ে গেছে জমির শেখ। কথা ছিল একটা কবর খোঁড়ার। এখন দুটা খুঁড়তে হবে। একটা নন্তু শেখের জন্যে আরেকটা জমির শেখের জন্যে। রাতে কবিরাজ আনতে যাওয়ার সময় ভেদবমি শুরু হয় ওর। বাড়িতে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরে মারা গেছে ও।

আগে মরার জন্যে কবর খোঁড়ার কাজটা নন্তু শেখ করতো। গত ত্রিশ বছর ধরে এ গাঁয়ে যত লোক মরেছে সবার জন্যে কবর খুঁড়েছে সে। কোদাল হাতে কবর খোঁড়ার সময় প্রায়ই একটা গান গাইতো নন্তু শেখ। আজ ওর কবরের ছক কাটতে গিয়ে সে গানটার কথা মনে পড়ে গেল মন্তুর।

এই দুনিয়া দুই দিনের মুসাফিরখানা ও ভাইরে।
মইরলে পরে সব মিয়ারে যাইতে হইবো কবরে।

মাটি খুঁড়তো আর টেনে টেনে গান গাইতো নন্তু শেখ। বলত, কত মানুষেরে কবর দিলাম, কত কবর খুঁইড়লাম এই জীবনে। তার হিসাব কি আর আছে মিয়া। এমনও দিন গ্যাছে যহন, একদিন সাত আটটা কইরা মাটি দিছি।

গোরস্তানে কার কোন্‌টা কবর, কাকে কোনদিন এবং কোথায় কবর দিয়েছে, সব কিছু মুখে মুখে বলে দিতে পারতো নন্তু। আর যখন কবর খুঁড়তে গিয়ে মানুষের অস্থি কিংবা মাথার খুলি পেতো সে, তখন সবাইকে দেখিয়ে বিজ্ঞের মতো বলত, চিনবার পার এরে ? না না, তোমরা চিনবা কেমন কইরা। আমি চিনি। এইডা কলিমুল্লা মাঝির মাইয়ার খুলি।

এইহানেই তো কবর দিছিলাম ওরে। আহা মাইয়া আছিল বটে একডি। যেন টিয়া পাখির ছাও। যে একবার দেইখছে সেই আর ভুলবার পারে নাই। বলে খুলিটার দিকে খুব ভালো করে তাকাত নন্তু শেখ। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার করে দেখত ওটা, আহা কি মাইয়া কি অইয়া গেছে। সোনার চাঁদ সুরত এখন চিনবারই পারা যায় না। অতি দুঃখের সঙ্গে নন্তু আবার বলত, গলায় ফাঁস দিয়া মইরছিল অভাগী। জামাইর সঙ্গে বনিবনা অইতো না, তাই। খুলিটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নন্তু বলে যেতো, সেই, বহুত দিনের কথা মিয়া, তহন তোমরা সব মায়ের পেটে আছিলা। সেই নন্তু শেখের মৃতদেহটা কবরে নামাতে গিয়ে চোখজোড়া পানিতে ঝাপসা হয়ে এল মন্তুর। মইরলে পরে সব মিয়ারে যাইতে অইবো কবরে। সারাদিন আর বাড়ি ফিরলো না মন্তু। দিঘির পাড়ে কাটিয়ে দিল সে। ওর মায়ের কবরটা দেখল। এককালে বেশ উঁচু ছিল ওটা। অনেক দূর থেকে চোখে পড়তো, এখন মাটির নিচে খাঁদ হয়ে গেছে এক হাঁটু। অনেকগুলো ছোট ছোট গর্ত নেমে গেছে ভেতরের দিকে, সেখানে মায়ের দুএকখানা হাড় হয়ত আজও খুঁজে পাওয়া যাবে। মায়ের জন্যে আজ হঠাৎ ভীষণ কান্না পেল ওর। মনে হল ও বড় একা। এ দুনিয়াতে ওর কেউ নেই।

শুকনো পাতার শব্দে পেছনে ফিরে তাকাল মন্তু। টুনি দাঁড়িয়ে পেছনে। সারাদিন ওর দেখা না পেয়ে অনেক খোঁজের পর এখানে এসেছে সে। মন্তুকে ওর মায়ের কবরের পাশে বসে থাকতে দেখে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল টুনি।

তারপর ওর কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে আস্তে করে বলল, ঘরে যাইবা চল। কোনো কথা না বলে নীরবে উঠে দাঁড়াল মন্তু। কিন্তু তক্ষুণি বাড়ি ফিরল না সে।

বলল, তুমি যাও আমি আহি।

টুনি উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, কই যাইবা ?

মন্তু বলল, যাও না আইতাছি। বলে টুনিকে সঙ্গে নিয়ে পরীর দিঘির পাড় থেকে নেমে এল সে।

ও যখন বাড়ি ফিরে এল তখন বেশ রাত হয়েছে। বার বাড়ি থেকে মন্তু শুনতে পেল গনু মোল্লা ওরা বসে বসে কি যেন আলাপ করছে।

গনু মোল্লা বলছে, সব অইছে খোদার কুদরত বাপু। নইলে এই দিনে তো কোনোদিনই ওলা বিবিরে আইতে দেহি নাই।

মকবুল বলল, ওলা বিবির আর আজকাইল দিনকাল কিছু নাই। যহন তহন আহে।

আমেনা বলল, এক পা খোঁড়া বিবির। তবু যেন কেমন কইরা এত বাড়ি বাড়ি যায়, আল্লাহ মালুম।

ওর কথা শেষ না হতেই টুনি জিজ্ঞেস করল, কেমন কইরা ওর এক পা খোঁড়া অইল বুয়া ?

তখন টুনিকে বুঝাতে লেগে গেল আমেনা।

ওলা বিবি, বসন্ত বিবি আর যক্ষ্মা বিবি ওরা ছিল তিন বোন এক প্রাণ। যেখানে যেত একসঙ্গে যেতো ওরা। কাউকে ফেলে কেউ বেরুত না বাইরে।

একদিন যখন খুব সুন্দর করে সেজেগুজে ওরা রাস্তায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল তখন হঠাৎ হযরত আলীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের। রঙিন শাড়ি পরে বেরুলে কি হবে, ওদের চিনতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হল না হযরত আলীর। তিনি বুঝতে পারলেন ওরা একজন কলেরা, একজন বসন্ত আর একজন যক্ষ্মা বিবি। মানুষের সর্বনাশ করে বেড়ায় এরা। আর তহনি এক কান্ড কইরা বইসলেন তিনি। খপ কইরা মা ওলা বিবির একখানা হাত ধইরা দিলেন জোরে এক আছাড়। আছাড় খাইয়া একখানা পা ভাইঙ্গা গেল ওলা বিবির। আহা সব খোদার কুদরত। মকবুল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, একখানা পা দিয়া দুনিয়াডারে জ্বালাইয়া খাইতাছে বেটি। দুই পা থাইকলে তো দুনিয়াডারে একদিনে শেষ কইরা ফালাইত।

হঠাৎ মন্তুর দিকে চোখ পড়তে বুড়ো মকবুল মুহূর্তে রেগে গেল। কিরে নবাবের বেটা তোরে একশবার কই নাই, মাঝি-বাড়ি যাইস না, গেলি ক্যান অ্যাঁ ?

গনু মোল্লা বলল, আক্কেল পছন্দ নাই তোর।

সুরত আলী বলল, বাড়ির কারো যদি এহন কিছু অয় তাইলে কুড়াইল মাইরা কল্লা ফালাইয়া দিমু তোর।

ফকিরের মা বুড়ি এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সে বলল, বাপু গেলেই কি অইবো আর না গেলেই কি অইবো না, যার মউত আল্লায় যেই দিন লেইখা রাইখাছে সেই দিন অইবো। কেউ আটকাইবার পারব না।

ঠিক কইছেন চাচি, আপনে ঠিক কইছেন। সঙ্গে সঙ্গে ওকে সমর্থন জানাল টুনি।

ওর কথা শেষ হতেই হঠাৎ ফাতেমা জানাল, গত রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছে সে। দেখেছে একটা খোঁড়া কুকুর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওদের গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে।
বড় ভালা দেখছ বউ। বড় ভালা দেখছ। ফকিরের মা পরক্ষণে বলল, ওই খোঁড়া কুত্তা, খোঁড়া মোরগ আর গরুর সুরত ধইরাই তো আহে ওলা বিবি। এক গেরাম থাইকা অন্য গেরামে যায়। বলে সমর্থনের জন্যে সবার দিকে এক নজর তাকাল সে।
মকবুল জানাল, শুধু তাই নয় মাঝে মাঝে খোঁড়া কাক, শিয়াল কিম্বা খোঁড়া মানুষের রূপ নিয়েও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াত করেন ওলা বিবি।
হ্যাঁ মিয়ারা। বুড়ো মকবুল সবাইকে সাবধান করে দিল। খোঁড়া কিছুরে বাড়ির ধারে-কাছে আইতে দিয়ো না তোমরা। অচেনা কোনো খোঁড়া মানুষও না। দেখলেই ওইগুলারে তাড়ায়ে খাল পার কইরা দিও।
সকলে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। হ্যাঁ তাই করবে।
রাতে ঘুম হল না মন্তুর।
সারাক্ষণ বিছানায় ছটফট করল সে।
পরীবানুর পুঁথির কথা মনে পড়ল মন্তুর। সুরত আলী মাঝে মাঝে সুর করে পড়ে ওটা।
কুলাটিয়া গ্রামের এক গৃহস্থের বউ পরীবানু। স্বামীর সঙ্গে মিলমিশ হত না। অষ্টপ্রহরে ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকত। ঘর ছেড়ে পুকুর পাড়ে গিয়ে নীরবে বসে থাকত সে। আর সেখান থেকে দেখত একটি রাখাল ছেলেকে। দূরে একটা বট গাছের নিচে বসে একমনে বাঁশি বাজাত সে। এমনি চোখের দেখায় প্রেম হয়ে গেল।
তারপর
তারপর একদিন সময় বুঝিয়া।
দুইজনে পালায়া গেল চোখে ধুলা দিয়া।
মন্তুরও তাই মনে হল। টুনিকে নিয়ে যদি একদিন পালিয়ে যায় সে। দূরে, বহুদূরে, দূরের কোনো গ্রামে কিম্বা শহরে। না শান্তির হাটে যদি ওকে নিয়ে যায় সে তাহলে মনোয়ার হাজি নিশ্চয় একটা বন্দোবস্ত করে দেবে। সেখানে টুনিকে নিয়ে সংসার পাতবে মন্তু। যে-কোনো দোকানে হাজিকে দিয়ে একটা চাকুরী জুটিয়ে নেবে সে। এমনি আরো অনেক চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লো মন্তু।
সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরুতেই আমেনা জিজ্ঞেস করল, নন্তু শেখের বাড়ির কোনো খবর জান ?
না।
ওমা জান না ? নন্তু শেখের ছেলে করিম শেখ পড়েছে আজ।
মন্তু কোনো কথা বলল না।
আমেনা বলে চলল, কবিরাজে কিছু কইরবার পারল না। তাই তো গনু মোল্লারে ডাইকা নিছে। একটু ঝাড়ফুঁক দিয়া যদি কিছু অয়।
মন্তুকে চুপ করে থাকতে দেখে আমেনাও চুপ করে গেল।
অবশেষে আরও আট দশটি প্রাণ হরণ করে তবে গ্রাম থেকে বিদায় নিলেন ওলা বিবি। গ্রামের সবাই মসজিদে সিন্নি পাঠালো। মিলাদ পড়ালো বাড়ি বাড়ি।
ওলা বিবি গেলেন। আর দিন কয়েক পরে বৃষ্টি এল জোরে। আকাশ কালো করে নেমে এল অবিরাম বর্ষণ। সারা রাত মেঘ গর্জন করল। বাতাস বইলো আর প্রচণ্ড বেগে ঝড় হল।
আগের দিন বিকেলে আকাশে মেঘ দেখে বুড়ো মকবুল তার পুরনো লাঙলটা ঠিক করে নিয়েছে। গরু নেই ওর। রওশন ব্যাপারির কাছ থেকে একজোড়া গরু ঠিকে নিবে। যে কদিন হাল চলবে সে কটা দিনের জন্যে নগদ টাকা দিতে হবে। তাছাড়া গরুর ঘাস-বিচালির পয়সাটাও জুটাতে হবে তাকে।
ভোর না হতেই সবাই বেরিয়ে পড়ল মাঠে।
আবুল, মন্তু, সুরত আলী, রশীদ, বুড়ো মকবুল আর গ্রামের সবাই।
পুরুষেরা কেউ বাড়ি নাই।

পুরো মাঠজুড়ে হাল পড়েছে। পাথরের মত শক্ত মাটি বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে নরম হয়ে গেছে।
হট হট হট, হুঁ উঁ উঁ।
বড় মিয়ার জমিতে লাঙল নামিয়েছে মন্তু আর সুরত।
এককালে এ জমিটা সুরত আলীর ছিল। সরেস জমি। প্রায় মণ সাতেক ধান ফলত তখন। ধানের ভারে গাছগুলো সব নুয়ে পড়ে থাকত মাটিতে।
নিজ হাতে ক্ষেতে লাঙল দিত সুরত। মই দিত। ধান ফেলত খুব সাবধানে। গাছ উঠলে, বসে বসে আগাছাগুলো পরিষ্কার করত।
ছাই আর গোবর ছড়িয়ে দিয়ে যেতো প্রতিটি অঙ্কুরের গোড়ায়। তারপর খাজনার টাকা জোটাতে না পেরে ওটা বড় মিয়ার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে সে।
আহা জমিডার কি অবস্থা কইরাছে দেখছস ? লাঙল ঠেলতে ঠেলতে সুরত আলী বলল, জমির লাইগা ওগো আধ পয়সার দরদ নাই। দরদ নাই দেইখাই তো জমিনও ফাঁকি দিবার লাগছে।
মন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলল, গেল বছর মোটে দেড় মণ ধান পাইছে।
কোথায় সাত মণ আর কোথায় দেড় মণ।
বুকটা ব্যথায় টনটন করে উঠল সুরত আলীর। রুগ্ন গরু দুইটাকে হট হট করে জোরে তাড়া দিয়ে বলল, জমির খেদমত করন লাগে। বুঝলা মন্তু মিয়া, জমির খেদমত করন লাগে। যত খেদমত কইরবা তত ধান দিব তোমারে।
শেষের কথাগুলো স্পষ্ট করে শোনা যায় না। আপন মনে বিড়বিড় করে সুরত। হঠাৎ কোনখানে যদি কতগুলো টাকা পেয়ে যেত তাহলে জমিটাকে আবার কিনে নিত সে। তখন সাত মণের জায়গায় আট মণ ধান বের করত সে এ জমি থেকে।
আকাশে এখনও অনেক মেঘ, দক্ষিণের বাতাসে উত্তরে ভেসে যাচ্ছে ওরা। যেকোনো মুহূর্তে বৃষ্টি হয়ে নেমে আসতে পারে নিচে। সুরত তখনো বলে চলছে আপন মনে। খোদার ইচ্ছা অইলো, জমিনগুলান আমার থাইকা কাইড়া নিলো। খোদার ইচ্ছা অইলো জমিনগুলান বড় মিয়ারে দিয়া দিলো। জমির লাইগা যার একটুও মায়াদয়া নাই তারেই দিল খোদা দুনিয়ার সকল জমি। এইডা কেমনতর ইনছাফ অইলো মন্তু মিয়া ? ইনছাফ ইনছাফ করো মিয়া। এইডা কেমন তর ইনছাফ অইলো মন্তু মিয়া ? হির্‌র্। হট হট। হুঁ উঁ উঁ। গরুগুলোর লেজ ধরে জোরে তাড়া দিল সুরত আলী।
অদূরে রশীদ তার জমিতে ধান ফেলছে। মিশকালো দেহ বেয়ে চুইয়ে চুইয়ে ঘাম ঝরছে ওর। হাঁটার সময় মনে হচ্ছে মুখ থুবড়ে খেতের মধ্যে পড়ে যাবে সে। ওটাও বড় মিয়ার খেত। বর্গা নিয়ে চাষ করছে রশীদ। ওর পাশের খেতে মই জুড়েছে বুড়ো মকবুল। কাজ করার সময় আশেপাশের দুনিয়াকে একেবারে ভুলে যায় সে। কোথায় কি ঘটছে লক্ষ করে না। ধান ফেলা শেষ হলে, রশীদ ডাকলো অ-ভাইজান।
মকবুল মুখ না তুলেই জবাব দিল, কি, কও না।
ধান তো ফালায়া দিলাম আল্লার নাম নিয়া।
দাও, দাও, ফালায়া দাও। এহন যত তাড়াতাড়ি ফালাইবা তত লাভ।
আর লাভের কথা কইও না। গরুজোড়ার সঙ্গে মই জুড়তে জুড়তে রশীদ জবাব দিল। ধান বেশি অইলেইবা কি বড় মিয়াকে অর্ধেক দিয়া দেওন লাগব।
ওই দিয়া থুইয়া যা থাকে তাই লাভ। মকবুল সান্ত্বনা দিল ওকে।
সুরত আলী তখনও আপন মনে বলে চলেছে, পরের জমিতে কোনো আরাম নাই মন্তু মিয়া, পরের জমি, আরে গরুগুলোর আবার কি অইলো। হট, হট, হুঁ উঁ উঁ।
মন্তু ততক্ষণে গান ধরেছে।
হঠাৎ গান থামিয়ে গরুজোড়ার লেজ ধরে সজোরে টান দিল মন্তু।
ইতি, ইতি, ইতি, চল।
সুরত বলল, গান থামাইলি ক্যান মন্তু। গাইয়া যা, গাইয়া যা।

মন্তু বলল, না ভাইজান গলাডা হুকাইয়া গেছে, গান বাইরয় না।
হ, হ, দুনিয়াডাই হুকাইয়া গেছে মন্তু মিয়া। তোর গলা হুকায় নাই।
জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সুরত আলী। আমাগো জমানায় আহা, কত গান গাইছি, কত ফুর্তি কইরছি। আর অহন দুনিয়াডাই আরেক রকম হইয়া গেছে মন্তু মিয়া। গাজী কালুর দুনিয়া আর নাই। সোনাভানের দুনিয়া পুইড়া ছাই অইয়া গেছে। বলে কর্কশ গলায় সে নিজে একখানা গান ধরলো।

যা ছিল সব হারাইলাম হায় পোড়া কপাল দোষে।
ও খোদা,
আমার কপাল এমন তুমি কইরলা কোন দোষে।

গান গাইতে গাইতে খুক খুক করে অনেকক্ষণ কাশল সুরত। বাঁ হাত দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিলো। থাম থাম আরে থামরে নবাবের বেটা। থাম। গরুগুলোকে থামিয়ে তামাক খাওয়ার জন্যে আলের ধারে এসে বসল সে। বলল, মন্তু মিয়া, আহ তামুক খাইয়া লও। তামাকের গন্ধ পেয়ে মকবুল আর রশীদ ওরাও খেত ছেড়ে উঠে এল। জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে বুড়ো মকবুলের দিকে হুঁকোটা বাড়িয়ে দিল সুরত। প্রথমে এক নিঃশ্বাসে কিছুক্ষণ হুঁকো টানলো মকবুল। তারপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, মন্তু মিয়া তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে আইজ। সইন্ধ্যা বেলা বাড়ি থাইকো।
রশীদ আর সুরত একবার হুঁকোর দিকে তাকাল, কিছু বলল না।
ওদের নজর এখন হুঁকোর দিকে।
সন্ধ্যে বেলা বুড়ো মকবুলের কাছ থেকে কথাটা শুনল মন্তু। ওর বিয়ের কথা।
মকবুল ঠিক করেছে এবার সত্যি সত্যি একটা বিয়ে করিয়ে দিবে মন্তুকে। চাচা-চাচি এতদিন বেঁচে থাকলে নিশ্চয় বিয়ে দিয়ে দিতেন।
চাচা নেই। মকবুল বেঁচে আছে। বাড়ির মুরব্বি সে। এ ব্যাপারে তার একটা দায়িত্ব রয়েছে।
পাত্রী ঠিক করে নিয়েছে মকবুল। মাঝি-বাড়ির আম্বিয়া।
নন্তু শেখ আর তার ছেলে করিম শেখ কলেরায় মারা যাবার পর আম্বিয়া একা। বসত বাড়িটা, বাড়ির ওপরের ছোট খেতটা আর সে নৌকাটার এখন মালিক সে।
ওকে বিয়ে করলে মন্তু অনেকগুলো সম্পত্তি পেয়ে যাবে একসঙ্গে।
রশীদ তার ঘরের চালায় খড় দিয়ে ফুটোগুলো মেরামত করছিল।
তাকে ডাকল মকবুল। তোমরা এইটার একটা ফয়সালা কইরা ফালাও মিয়া। ওই মাইয়া বেশিদিন থাকবো না। বহু লোকের চোখ পইড়াছে।
ওপর থেকে রশীদ বলল, মাইয়ার হাঁপানি, শেষে বাড়ির সক্কলের হাঁপানি অইবো।
মকবুল সঙ্গে সঙ্গে বলল, আরে একবার বিয়া কইরা সম্পত্তিগুলান হাত কইরা নিক। পরে দেহা যাইবো, যদি হাঁপানি হয় তো তালাক দিয়া দিব। মন্তু সহসা কিছু বলল না। সে জানে বিয়ে তাকে করতে হবে। আম্বিয়াকে অনেক ভালো লাগছিল তার। সেদিন যদি বুড়ো মকবুল বলত, তাহলে তক্ষুণি রাজি হয়ে যেত সে। আজ ভাবতে গিয়ে অদূরে দাঁড়ানো টুনির দিকে তাকালো মন্তু।
বুড়ো মকবুল বলল, অমন সম্বন্ধ আর পাইবি না মন্তু। চিন্তা করার কিছু নাই। মত দিয়া দে। কাইল রাইতে গিয়া ওর চাচা ছমির শেখের সঙ্গে আলাপ কইরা আহি।
ফকিরের মা বলল, আপনেরা মুরুব্বি, আপনেরা ঠিক কইরা ফালান।
আমেনা বলল, ঠিক কথা কইছ চাচি।
মন্তু তখনও ভাবছে।
একটা বসতবাড়ি। একটা নৌকো। আর বাড়ির ওপরে এক টুকরো খেত। দেখতেও সুন্দরী সে।
বুড়ো মকবুল বলল, তাইলে ওই কথাই রইল। কাইল রাইতের বেলা ওর চাচার সঙ্গে আলাপ করি গিয়া।
মন্তু চুপ করে রইল, তারপর খুব আস্তে করে বলল ও, আপনেরা যেইডা ভালা মনে করেন, করেন।

মুখ তুলে তাকাতে পারলো না সে। রসুই ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে টুনি। দাঁত দিয়ে হাতের নখ কাটছে সে।
মন্তুর কথা শুনে সহসা শব্দ করে হেসে উঠল সে। বলল, আমাগো মন্তু মিয়ার বিয়ায় কিন্তুক বড় দেইখ্যা একখানা পালকি আনন লাগব।
বিয়ের কথা শুনে সুরত আলী আর আবুলও সমর্থন জানালো। গনু মোল্লা বলল, ভালা অইছে। মন্তু এইবার সংসারী অইবো।
রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর টুনি মকবুলকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে আমার একডা কথা আছে।
মকবুল রেগে উঠল। এই রাতের বেলা এখন ঘুমাতে যাবে। এই সময়ে আবার এমন কি কথা বলতে চায় টুনি।
রেগে বলল, কাইল দিনের বেলা কইয়ো।
টুনি বলল, না অহনি লাগব।
বুড়ো মকবুল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, আচ্ছা কও কি কথা।
চারপাশে দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে কথাটা বলল টুনি। মকবুল বড় বোকা। নইলে এমন সুযোগটা কেন হেলায় হারাচ্ছে সে। একটা বসত বাড়ি। একটা খেত। আর একটা নৌকো। ইচ্ছে করলে ওগুলোর মালিক সেও হতে পারে। সে কেন বিয়ে করে না আম্বিয়াকে। বুড়ো মকবুল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। এ সম্ভাবনার কথা সে নিজেও ভাবেনি এর আগে। টুনি যা বলল, শুধু তাই নয় আরো লাভ আছে আম্বিয়াকে বিয়ে করায়। সারাদিন একটানা ধান ভানতে পারে সে। খাটতে পারে অসম্ভব।
ওকে চুপ করে থাকতে দেখে টুনি আবার বলল, চিন্তা কইরতাছেন কি, চিন্তা করার কিছুই নাই।
এ মুহূর্তে টুনিকে ওর নিজের চেয়েও অনেক বড় বলে মনে হল মকবুলের। মনে হল টুনির কাছে নেহাত একটা শিশু সে।
একটু পরে চাপা গলায় মকবুল বলল, বড় বউ আর মাইঝা বউ যদি রাজি না হয় ?
টুনি বলল, রাজি অইব না ক্যান। নিশ্চয় অইবো।
মকবুল বলল, ওগো না অয় রাজি করন গেল। কিন্তু আম্বিয়া ?
মকবুলের কণ্ঠস্বরে গভীর অন্তরঙ্গতা।
টুনি বলল, চেষ্টা কইরলে সব অয়, অইব না ক্যান ?
এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ওরা। মকবুল বলল, বহ বউ। বহ।
টুনি বসল ওর পাশে। দু'জনে পাশাপাশি। মকবুলের কাঁধের ওপর একখানা হাত রাখল টুনি। তারপর নীরবে অনেকক্ষণ বসে রইল ওরা। বাড়ির কাচ্চাবাচ্চাদের উঠোনে বসিয়ে কিচ্ছা বলছে ফকিরের মা। চাঁদ সওদাগরের কিচ্ছা। এক মনে হা করে শুনছে সবাই।
সালেহা কাঁদছে ওর ঘরে। কাল দুপুরে ওর মুরগিটাকে শিয়ালে নিয়ে গেছে ধরে। সেই শোকে কাঁদছে সে।
আমেনা আর ফাতেমা দু'জনকে ডেকে এনে সামনে বসিয়ে কথাটা বলল বুড়ো মকবুল।
শুনে আমেনা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, এমন কি অভাব আছে আপনের যে ওকে বিয়ে করতে চান ?
ফাতেমা বলল, এই বুড়ো বয়সে মাইনষে কইবো কি ?
টুনি বলল, মাইনষের কথা হুইনা কি অইবো। মাইনষে তো অনেক কথা কয়। তবু ফাতেমা আর আমেনা ঘোর আপত্তি জানাল। মকবুল অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল ওদের। কিন্তু ওরা রাজি হল না।
অবশেষে মকবুল রেগে গেল। শাসিয়ে বলল, অত কথা বুঝি না। আম্বিয়ারে বিয়া আমি করমুই। তোমরা পছন্দ কর কি না কর।
কথাটা চাপা থাকল না।
পরদিন বাড়ির সবাই জেনে গেল ব্যাপারটা।
মন্তুর বিয়ে সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে নিজের বিয়ের কথা বলে এসেছে মকবুল।
কথাটা আমেনা আর ফাতেমার কাছ থেকে শুনেছে সবাই।
মন্তু রীতিমতো অবাক হল।

সালেহা উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, ইতা কেমন কথা অ্যাঁ। মাইনষে হুনলে কইবো কি ?

ফকিরের মা বলল, মকবুল মিয়ার এইডা উচিত অয় নাই। যাই কও মিয়া, এইডা উচিত অয় নাই।

আমেনা আর ফাতেমা দুজনে মিলে গনু মোল্লার কাছে কাঁদাকাটি করেছে। বলেছে, মাইনষে হাসাহাসি কইরবো। আপনে ওনারে বাধা দ্যান। আপনের কথা উনি হুনবেন। সুরত আর আবুলকে ডেকে ওদের সঙ্গে আলাপ করল গনু মোল্লা। বলল, বাড়ির বদনাম অইয়া যাইব।

শুনে সুরত আলী আর আবুল দুজনে ক্ষেপে উঠল। এইসব কি অ্যাঁ, বুড়ার কি ভীমরতি অইছে নাহি ?

আবুল বলল, বুড়ো বয়সে এইসব কি পাগলামি শুরু অইছে।

কিছু বলল না শুধু মন্তু।

রাতে গনু মোল্লার ঘরে জমায়েত হল সবাই।

রশীদ এল। আবুল এল। সুরত আলী, সালেহা, আমেনা, ফাতেমা, ফকিরের মা সবাই এল।

এল না শুধু মন্তু, টুনি, আর যাকে নিয়ে বসা সেই বুড়ো মকবুল।

মকবুল তার ঘরের মধ্যে নীরবে বসে রইল।

সব কিছু সেও শুনেছে।

গনু মোল্লার ঘরে ওরা কেন জমায়েত হয়েছে সব বুঝতে পেরেছে সে।

এর মূলে আমেনা আর ফাতেমা। ওর দুই স্ত্রী। যাদের এতদিন খাইয়েছে পরিয়েছে সে। নিমকহারাম, এক নম্বরের নিমকহারাম। চাপা আক্রোশে গর্জাতে লাগল বুড়ো মকবুল। টুনি বলল, ওগো হিংসা অইতাছে। ওরা চায় না আপনে সম্পত্তির মালিক অন।

টুনি ঠিক বলেছে, বাড়ির কেউ চায় না ও আম্বিয়াকে বিয়ে করুক।

বিয়ে করলে একদিনে অনেকগুলো সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে বুড়ো মকবুল। বাড়ির কেউ সেটা সহ্য করতে পারছে না।

এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে ওর হাতে তুলে দিল টুনি। বলল, মাথা গরম কইরেন না। এই সময় মাথা ঠান্ডা রাখন লাগে।

গনু মোল্লার ঘরে সবাই জমায়েত হলেও মকবুলকে সেখানে ডেকে আনার জন্যে যেতে কেউ সাহস করল না।

আবুল বলল, সুরতকে যেতে।

সুরত বলল, ফকিরের মার কথা। ফকিরের মা ভয়ে আঁতকে উঠে বলল, ওরে বাবা আমি যাইবার পারমু না।

অবশেষে গনু মোল্লাকে আসতে হল।

উঠান থেকে মকবুলের নাম ধরে ডাকলো সে।

মকবুল বেরুলো না। বেরিয়ে এল টুনি।

একটু পরে ভেতরে এসে টুনি বলল আপনারে যাইতে কয়।

গনু মোল্লাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বুড়ো মকবুল বলল, ক্যান, ক্যান যাইতে কয়।

টুনি বলল, কি কথা আছে।

মকবুল বলল, কথা এখানে আইসা কইতে পারে না। আমি যামু ক্যান ? টুনি ওকে শান্ত করল। বলল, মাথা গরম কইরেন না, যান না ওরা কি কয় শুনেন গিয়া।

স্ত্রীর মুখের দিকে পরম নির্ভরতার সঙ্গে তাকাল বুড়ো মকবুল।

তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়াল সে।

বুড়ো মকবুলকে গনু মোল্লার ঘরে ঢুকতে দেখে নড়েচড়ে বসল সবাই।

কারো মুখে কথা নেই।

টুনি এসে দাঁড়িয়েছে বুড়ো মকবুলের পাশে।

গনু মোল্লা তার নামাজের চৌকিটার ওপরে বসল।

সবাই চুপ।

কেউ কিছু বলছে না।

কথাটা কি দিয়ে যে শুরু করবে ভেবে উঠতে পারছে না কেউ।

টুনিই প্রথম কথা বলল, কই আপনেরা কিছু কইতেছেন না ক্যান। ক্যান ডাকছেন, কন না।

সুরত আলী নড়েচড়ে বসল।

আমেনা নীরব।

ফাতেমা মাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

গনু মোল্লা বলল, মন্তুর বিয়ার ব্যাপারটা কি অইছে। কথাটা বলে মকবুলের দিকে তাকাল সে।

বুড়ো মকবুল কোনো জবাব দেবার আগেই টুনি বলল, মন্তু কইছে ও আম্বিয়ারে বিয়া করবো না।

ওর কথা শুনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল সবাই।

ফকিরের মা বলল, কই মন্তু মিয়া কই, তারে ডাহ না।

কিন্তু মন্তুকে বাড়িতে খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে সে। টুনি বলল, ডাহন লাগবো না ওরে, ও আমারে কইছে বিয়া কইরবো না।

আবুল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, তাইলে আমি বিয়া করুম আম্বিয়ারে।

আমার ঘরে বউ নাই খানাপিনার অসুবিধা অয়।

ওর কথা সম্পূর্ণ না হতেই আমেনা আর ফাতেমা একসঙ্গে বলে উঠল, হু তোমার একটা বউ দরকার।

বুড়ো মকবুল টুনির দিকে তাকাল।

টুনি বলল, ক্যান, ধইরা ধইরা মাইরা কবরে পাঠাইবার লাইগা নাহি।

আবুল রেগে উঠল, আমার বউ যদি আমি মারি তোমার তাতে কি ?

চুপ কর বেয়াদব, হঠাৎ গর্জে উঠল মকবুল। এই জিন্দেগিতে আর তোরে বিয়া করামু না আমরা। তিন তিনটা মাইয়ারে তুই কবরে পাঠাইছস। আবার বিয়ার নাম করছে, শরমও লাগে না। একটুখানি দম নিয়ে বুড়ো পরক্ষণে বলল, আম্বিয়ারে আমি বিয়া করমু ঠিক করছি। বলে টুনির দিকে তাকাল সে।

আমেনা আর ফাতেমা পরমুহূর্তে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, আপনেরা শুনছেন, শুনছেন আপনেরা ইতা কিতা কইবার লাগছে উনি।

যা কইছি ঠিক কইছি। আঙুল তুলে ওদের দুইজনকে শাসাল মকবুল। তোমাগো যদি ভালো না লাগে তোমরা বাড়ি ছাইড়া চইলা যাও।

শুনছেন শুনছেন আপনেরা। কি কয় শুনছেন। আমেনা কেঁদে ফেলল। গনু মোল্লা বলল, এইডা ঠিক অইলো না মকবুল মিয়া। এইডা কোনো কামের কথা অইলো না। এই বুড়ো বয়সে আরেকডা বিয়া কইরলে মাইনষে কি কইবো।

সুরত আলী আর ফকিরের মা বলল, মাইনষে বাড়ির বদনাম করবো।

আমেনা বলল, মাইয়া বিয়া দিছে, তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ছি ছি কইরবো না।

কটমট চোখে আমেনার দিকে তাকাল মকবুল।

ফাতেমা বলল, বুড়ো বয়সে ভূতে পাইছে।

'নিমকহারাম' বলে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল বুড়ো মকবুল। তারপর অকস্মাৎ এক অবাক কাণ্ড ঘটিয়ে বসল সে। ঘরের মাঝখানে, এতগুলো লোকের সামনে হঠাৎ আমেনা আর ফাতেমা দুজনকে এক সঙ্গে তালাক দিয়ে দিল সে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, তোরা বাইরইয়া যা আমার বাড়ি থাইক্যা।

ঘটনার আকস্মিকতায় সকলে চমকে উঠল।

পরক্ষণে একটা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আমেনা।

ফাতেমা মূর্ছা গেল।

ফকিরের মা চিৎকার করে উঠল, আহারে পোড়াকপাইল্যা, এই কি কইরলি তুই, ওরে পোড়াকপাইল্যারে এই কি কইরলি।

আবুল হঠাৎ বসার পিঁড়িটা হাতে তুলে নিয়ে সজোরে ছুড়ে মারল মকবুলের কপাল লক্ষ্য করে। ঘাস খাইয়া বুড়া অইছ অ্যাঁ। ঘাস খাইয়া বুড়া অইছ, বেআক্কেইল্যা কোনহানের।

দুহাতে কপাল চেপে মাটিতে বসে পড়লো মকবুল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফিনকির মতো রক্ত ঝরছে ওর।

কান্না, চিৎকার, গালাগালি আর হা-হুতাশে সমস্ত ঘরটা মুহূর্তে নরকের রূপ নিল।

মকবুলকে দু'হাতে কাছে টেনে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল টুনি।

ফাতেমার মাথায় পানি ঢালতে লাগল সালেহা।

ফকিরের মা আমেনাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেলল।

উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে সব শুনল মন্তু। সব দেখল সে।

কিন্তু কাউকে কিছু বলল না। নীরবে পরীর দিঘির দিকে চলে গেল সে।

পরদিন বিকেলে খবর পেয়ে আমেনা আর ফাতেমার বাড়ির লোক এসে নিয়ে গেল ওদের। যাবার সময় করুণ বিলাপে পুরো গ্রামটাকে সচকিত করে গেল ওরা। এতদিনের গড়ে তোলা সংসার এক মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ঘরের পেছনে লাগানো লাউ কুমড়ার মাচাগুলোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমেনা। যাবার সময় ফকিরের মাকে কেঁদে কেঁদে বলে গেল, হীরনকে খবরডা দিয়ো না। শুইনলে, মাইয়া আমার বুক ভাসাইয়া মইরা যাইব। খোদার কসম রইল, বুয়া, মাইয়ারে আমার খবরডা দিয়ো না।

ফাতেমাকে নেয়ার জন্য ভাই এসেছিল ওর। যাবার সময় বাড়ির সবাইকে শাসিয়ে গেছে ও। বলে গেছে শিকদার-বাড়ির লোকগুলোকে একহাত দেখে নেবে সে। বোনের জন্য চিন্তা করে না ও। আগামী তিন মাসের মধ্যে এর চেয়ে দশগুণ ভালো ঘর দেখে ফাতেমার বিয়ে দিয়ে দেবে।

মকবুল বিছানায়। মাথায় ওর একটা পট্টি বেঁধে দিয়েছে টুনি। হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে বুড়োর। মাঝে দুএকবার চোখ মেলে তাকিয়েছিল। এখন নীরবে ঘুমুচ্ছে। টুনি পাশে বসে বাতাস করছে ওকে। রাতে গনু মোল্লা এল ওর ঘরে। বুড়ো মকবুলের গায়ে মাথায় হাত দিয়ে ওর জ্বর আছে কি না দেখল। তারপর আস্তে কইরা বলল, রাগের মাথায় ইতা কিতা কইরলা মিয়া। শরীর ভালা অইয়া গেলে ভাবীসাবগোরো বাড়ি নিয়া আহ। রাগের মাথায় তালাক দিলে তো আর তালাক অয় না। ওই তালাক অয় নাই তোমার।

এক বাটি বার্লি হাতে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল টুনি। ওকে আসতে দেখে গনু মোল্লা চুপ করে গেল।

টুনির ওপরে আক্রোশ পড়েছে সবার। সবাই বুঝতে পেরেছে, এই যে সব কাণ্ড ঘটে গেছে এর জন্যে টুনিই দায়ী।

উঠোনে দাঁড়িয়ে অনেকে অনেক কথা বলল। ওর নাম ধরে অনেক গালাগাল আর অভিশাপ দিল বাড়ির ছেলেমেয়েরা।

টুনি নির্বিকার। একটি কথারও জবাব দিল না।

দিন কয়েক পরে আম্বিয়ার চাচা ছমির শেখ জানিয়ে দিয়ে গেল, বুড়ো মকবুলকে বিয়ে করবে না আম্বিয়া।

তাছাড়া খুব শীঘ্রই আম্বিয়ার বিয়ের সম্ভাবনাও নেই।

কথাটা শুনল বুড়ো মকবুল। শুনে কোনো ভাবান্তর হল না। ঘরের কড়ি-কাঠের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে।

ইদানীং দিনরাত মকবুলের সেবা করছে টুনি। সারাক্ষণ সে ওর আশেপাশে থাকে। একটু অবকাশ পেলে রসুই ঘরে গিয়ে রান্নাবান্নার পাটটা সেরে আসে সে। মরিচ খেত আর লাউ কুমড়োর গাছগুলোর তদারক করে আসে। মাঝে মাঝে ফকিরের মা আর সালেহার আলাপ শুনে টুনি। মন্তু আর আম্বিয়াকে নিয়ে আলাপ করে ওরা। আজকাল নাকি অনেক রাত পর্যন্ত আম্বিয়াদের বাড়িতে থাকে মন্তু। টুনি শুনে। কিছুই বলে না। একদিন বিকেলে মন্তু যখন বাইরে বেরুবে তখন তার সামনে এসে দাঁড়াল টুনি। বলল, জ্বরডা ওর ভীষণ বাইড়া গেছে। কবিরাজের কাছ থাইকা একটু ওষুধ আইনা দিবা ?

ওর মুখের দিকে নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মন্তু। ভীষণ শুকিয়ে গেছে টুনি। হঠাৎ বয়সটা যেন অনেক বেড়ে গেছে ওর। চোখের নিচে কালি পড়েছে। চুলগুলো শুকনো।

মন্তু ইতস্তত করছিল।

টুনি আবার বলল, আজকা না হয় মাঝি-বাড়ি না গেলা। একটু ওষুধটা আইনা দাও।

ওর ঠোঁটের কোণে এক টুকরো ম্লান হাসি।

মন্তু কি জবাব দেবে ভেবে পেল না।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে টুনি আবার বলল, যাইবা না ক্যান, একশ বার যাইবা। ঘর থেকে বুড়ো মকবুলের ডাক শুনে আর সেখানে দাঁড়াল না টুনি। পরক্ষণে চলে গেল সে।

ওর চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল মন্তু। তারপর বাড়ির থেকে বেরিয়ে গেল।

রাতে কবিরাজের কাছ থেকে ওষুধ এনে দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল মন্তু। বর্ষা এগিয়ে আসছে। আম্বিয়া বলেছে, নৌকাটা ঠিক করে নেবার জন্যে। চাচা ছমির শেখ চেয়েছিল নৌকাটা নিজে বাইবে।

কিন্তু আম্বিয়া রাজি হয়নি। মন্তু ছাড়া অন্য কাউকে ওতে হাত দেবার অধিকার দিতে রাজি নয় সে।

ছমির শেখ রেগে গালাগাল দিয়েছে ওকে। মন্তু সম্পর্কে কতগুলো অশ্লীল মন্তব্য করে বলেছে, ওর সঙ্গে তোমার মিলামিশা কিন্তুক ভালো অইতাছে না আম্বিয়া। গেরামের লোকজনে পাঁচ রকম কথাবার্তা কইতাছে।

কউক। তাগো কথায় আমার কিছু আইবো যাইবো না। নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিয়েছে আম্বিয়া।

ওর স্পষ্ট উত্তরে প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়েছে ছমির শেখ। বলেছে, তোমার কিছু আহে না আহে, আমাগো আহে। মন্তুরে কিন্তুক এই বাড়িতে আইতে নিষেধ কইরা দিও বইলা দিলাম।

তবু বারবার মন্তুকে বাড়িতে ডেকেছে আম্বিয়া।

ও গেলে সংসারের নানা কথা নিয়ে আলাপ করেছে ওর সঙ্গে।

আজও মন্তুর জন্যে অপেক্ষা করছিল আম্বিয়া।

ও আসতে একখানা পিঁড়ি এগিয়ে দিল আম্বিয়া।

অর্ধেকটা মুখ ঘোমটার আড়ালে ঢাকা। সলজ্জ হাসির ঈষৎ আভাটা চোখে পড়েও যেন পড়তে চায় না।

আম্বিয়া বলল, এত দেরি অইলো ?

মন্তু বলল, কবিরাজের কাছে গিছলাম।

কেন গিয়েছিল তা নিয়ে আর প্রশ্ন করে না আম্বিয়া।

দূরে নিজ ঘরের দাওয়ায় বসে আড়চোখে বারবার এদিকে তাকায় ছমির শেখ আর বিড়বিড় করে কি যেন সব বলে।

রাতে ওখানে খেলো মন্তু।

পানটা মুখে পুরে বাইরে বেরিয়ে এল সে।

বাইরে তখন ইলশেগুঁড়ি পড়ছে।

কদিন পর পর বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তার ওপর দিয়ে পানি গড়াচ্ছে এপাশ থেকে ওপাশে। পানির সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট বেলে আর পুঁটি ছুটোছুটি করছিল এদিকে সেদিকে।

অন্ধকারের ভেতর মকু আর ছকু দু'ভাই মাছ ধরছিল বসে বসে।

মন্তুকে দেখে বলল, কি মিয়া এত রাইতে কোন্ দিক থাইক্যা ?

মাঝি-বাড়ি।

হুঁ। একটা পুঁটি মাছ ধরে নিয়ে ছকু বলল, চইল্যা যাও ক্যান মন্তু মিয়া। তামুক খাইয়া যাও।

না মিয়া শরীরডা ভালা নাই।

মন্তু যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে ছকু বলল, আরে মিয়া যাইবা আর কি বও। কথা আছে।

কি কথা কও। জলদি কও। পায়ের পাতায় ভর করে মাটিতে বসল মন্তু।

নিঝুম রাত। শুধু একটানা জল গড়ানোর শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে দুএকটা ব্যাঙ ডাকছে এখানে ওখানে। আরো তিন চারটে পুঁটি মাছ ধরে নিয়ে ছকু আস্তে বলল, কি মন্তু মিয়া তুমি নাহি করিমনের বইন আম্বিয়ারে বিয়া কইরতাছ হুনলাম। বলে অন্ধকারে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হাসল সে।

তামাক খেতে খেতে ওর দিকে তাকাল মন্তু। কিছু বলল না।

কি মন্তু মিয়া চুপ কইরা রইলা যে ? ওকে কনুইয়ের একটা গুঁতো মারল ছকু। বিয়া শাদি করবার আগে আমাগোরে একটু জানাইয়ো, একটু দাওয়াত টাওয়াত কইরো।

করমু। করমু। আগে বিয়া ঠিক হোক তারপর করমু। একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতপায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল সে।

দাওয়ার পাশে টুনি দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে হঠাৎ চেনা যায় না।
মন্তুর পায়ের গতিটা শ্লথ হয়ে এল।
উঠোনে সালেহা আর ফকিরের মা বসে, মন্তুর সঙ্গে আম্বিয়ার বিয়ে নিয়ে আলোচনা করছে ওরা।
আম্বিয়ার চাচা আজ বলেছে, সামনের শুক্রবার জুমার নামাজের পর গাঁয়ের মাতবরদের কাছে কথাটা তুলবে সে। বিচার চাইবে।
ফকিরের মা বলল, আমি কিন্তুক একটা কথা কইয়া দিলাম বউ। এই মাইয়া একেবারে অলক্ষুইণা। যেই ঘরে যাইবো সব পুড়াইয়া ছাই কইরা দিবো।
সালেহা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক কইছ চাচি।
কথাটা বলতে গিয়ে আমেনা আর ফাতেমার কথা মনে পড়ে গেছে ওদের। আম্বিয়ার জন্যেই তো ওদের তালাক দিয়েছে বুড়ো মকবুল।
নিজেও পড়েছে মরণ রোগে।
উঠোনে এসে এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল মন্তু।
সালেহা আর ফকিরের মা কথা থামিয়ে তাকাল ওর দিকে।
টুনি কিছু বলল না। একটু নড়লো না। চুপচাপ রইল।
মন্তু ঘরে গিয়ে দরজা এঁটে দিল।
কাল ভোরে আবার বেরুতে হবে ওকে।

।। দশ ।।

অবশেষে মকবুল মারা গেল।
ধলপহর হওয়ার অনেক আগে যখন সারা গ্রাম ঘুমে অচেতন তখন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিল সে।
সারা রাত কেউ ঘুমাল না।
গনু মোল্লা, আবুল, রশীদ, সালেহা, মন্তু, টুনি সবাই জেগে রইল মাথার পাশে।
সন্ধ্যাবেলা ফকিরের মা বলছিল লক্ষণ বড় ভালা না।
তোমরা কেউ ঘুমায়ো না মিয়ারা, জাইগা থাইকো।
বহুলোককে হাতের ওপর দিয়ে মরতে দেখেছে ফকিরের মা। তাই, রোগীর চেহারা আর তার ভাবভঙ্গি দেখে সে অনেকটা আন্দাজ করতে পারে।
সারা রাত প্রলাপ বকেছে বুড়ো মকবুল।
কখনো আমেনার নাম ধরে ডেকেছে সে। কখনো ফাতেমার জন্য উতলা হয়ে ওঠেছে। আবার কখনো প্রলাপের ঘোরে গরু তাড়িয়েছে। হুঁ হট-হট। আরে মরার গরু চলে না ক্যান। হুঁ হট-হট।
মাথার কাছে বসে সারাক্ষণ কুরআন শরীফ পড়লো গনু মোল্লা।
তারপর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এল বুড়ো মকবুল। প্রলাপ বন্ধ হল।
একটু পরে মারা গেল সে।
ওর বুকের ওপর পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল টুনি।
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল সে।
তার বিলাপের শব্দ অন্ধকারে কেঁপে কেঁপে দূরে পরীর দিঘির পাড়ে মিলিয়ে গেল।
বিস্ময়ভরা চোখে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল মন্তু।
পরদিন দুপুরে বুড়ো মকবুলের মৃতদেহটা যখন কাফনে আবৃত করে খাটিয়ার ওপর তোলা হল তখন বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠোনের মাঝখানে ডাঙায় তোলা মাছের মতো তড়পাতে লাগল টুনি। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা নানা সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল ওকে। সালেহা, ফকিরের মা, সুরতের বউ ওরাও অনেক কান্নাকাটি করল অনেকক্ষণ ধরে।

পরীর দিঘির পাড়ে বুড়ো মকবুলকে কবর দিয়ে আসার পর সবার মনে হল বাড়িটা যেন কেমন শূন্য হয়ে গেছে। একটা থমথমে ভাব নেমে এসেছে গাছের পাতায়। ঘরের চালে। উঠোনে। বাড়ির পেছনে। ছোট্ট পুকুরে। আর সবার মনে। একটি লোক দীর্ঘদিন ধরে একবারও ঘরের দাওয়ায় বেরুতে পারেনি, বিছানায় পড়েছিল। যার অস্তিত্ব ছিল কি ছিল না সহসা অনুভব করা যেত না, সে লোকটা আজ নেই। কিন্তু তার এই না থাকাই যেন সমস্ত থাকার অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে।

সারা দুপুর টুনি কাঁদল।

সারা বিকেল।

সারা সন্ধ্যা।

সালেহা অনেক চেষ্টা করে ওকে কিছু খাওয়াতে। সে খেল না।

ফকিরের মা বলল, কিছু খাও বউ। না খাইলে শরীর খারাপ অইয়া যাইবো। কিছু খাও।

তবু খেল না টুনি।

মন্তু, সুরত আলী, আবুল, রশীদ, কারো মুখে কোনো কথা নেই। কেউ দাওয়ায়, কেউ উঠোনে, কেউ দোর-গোড়ায় বসে। আজ সহসা যেন সমস্ত কথা হারিয়ে ফেলেছে ওরা।

মিয়াবাড়ির মসজিদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসছে। মাথায় টুপিটা পরে নিয়ে গামছাটা কাঁধে চড়িয়ে নামাজ পড়তে চলে গেল গনু মোল্লা। সুরত আলী, রশীদ আর আবুলও উঠে দাঁড়াল।

রোজ যে তারা নামাজ পড়ে তা নয়। কিন্তু আজ পড়বে। বুড়ো মকবুলের মৃত্যু হঠাৎ পরকাল সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে ওদের।

পুকুর থেকে অজু করে এসে সুরত আলী বলল, কই যাইবা না মন্তু মিয়া ?

মন্তু ওদের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর বলল, চলো।

বলতে গিয়ে গলাটা অস্বাভাবিকভাবে কেঁপে উঠলো ওর।

দিন তিনেক পর নৌকা নিয়ে বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল মন্তু।

টুনি ডাকলো, শোন।

মন্তু তাকিয়ে দেখল এ কয়দিনে ভীষণ শুকিয়ে গেছে টুনি।

চোয়ালের হাড় দুটো বেরিয়ে পড়েছে। চোখের নিচে কালি পড়েছে তার। মুখখানা বিষণ্ণ। মাথায় ছোট একটা ঘোমটা।

মন্তু বলল, কি।

টুনি চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে আস্তে করে বলল, আমার একটা কথা রাইখবা ?

মন্তু বলল, কও।

মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল টুনি। তারপর আস্তে করে বলল, আমারে একদিন সময় কইরা আমাগো বাড়ি পৌঁছায়া দিয়া আইবা ? টুনির চোখজোড়া পানিতে ছলছল করছে।

বুড়ো মকবুলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ির সাথে সকল সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে টুনির। আর কতদিন এখানে এমনি করে পড়ে থাকবে সে।

মন্তু আস্তে করে বলল, ঠিক আছে যামুনি। কোন্ দিন যাইবা ?

টুনি মৃদু গলায় বলল, যেই দিন তোমার সুবিধা হয়। বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল সে।

মন্তু বিব্রত বোধ করল। কি বলে যে ওকে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পেল না সে।

টুনি একটু পরে কান্না থামিয়ে বলল, বড় ইচ্ছা আছিল তোমার বিয়া দেইখা যামু, তোমার হাতে মেন্দি পরাইয়া যামু। থাকন আর গেল না।

এ কথার আর উত্তর দিলো না মন্তু। গাঁয়ে সবাই জানে, সামনের শীতে আম্বিয়াকে বিয়ে করছে ও। টুনিও জানে।

কাপড়ের আঁচলে চোখের পানি মুছে টুনি আবার বলল, বিয়ার সময় আমারে নাইয়র আনবা না ?

নিস্তেজ গলায় মন্তু পরক্ষণে বলল, আনমু।

সহসা ওর চোখের দিকে মুখ তুলে তাকালো টুনি। এক টুকরো ম্লান হাসিতে ঠোঁটজোড়া কেঁপে উঠলো ওর। আস্তে করে বলল, কথা দিলা মনে থাকে যেন।
মন্তু বলল, থাকবো।
একে একে বাড়ির সবার কাছ থেকে বিদায় নিল টুনি।
সবার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদল সে।
পরীর দিঘির পাড়ের ওপর দিয়ে আসার সময় দূর থেকে বুড়ো মকবুলের কবরটা চোখে পড়ল। শুকনো মাটির সাদা ঢেলাগুলো টিপির মতো উঁচু হয়ে আছে। সেদিকে তাকাতে সারা দেহ কাঁটা দিয়ে ওঠে। কি এক অজানা ভয়ে বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে যেন।
ভাটার স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে দিল মন্তু।
সেই নৌকা।
যার মধ্যে চড়িয়ে টুনিকে তার বাবার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল সে। দুধারে গ্রাম। মাঝখানে নদী। যতদূর চোখে পড়ে শুধু অথই জলের ঢেউ। বর্ষার পানিতে নদী নালা ক্ষেত সব এক হয়ে গেছে। এ সময়ে ভরা নদী দিয়ে নৌকা চালানোর প্রয়োজন হয় না। খেতের ধারে গেরস্থ বাড়ির পেছনের ডোবার পাশ দিয়ে নৌকা চালিয়ে নেয়া যায়। এতে করে পথ অনেক সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে।
টুনি ছইয়ের মধ্যে চুপচাপ বসে রইল। মাথায় ছোট একখানা ঘোমটা।
মন্তু সহসা বলল, বাইরে আইসা বস না। গায়ে বাতাস লাইগবো।
টুনি পরক্ষণে বলল, আইতাছি। কিন্তু সহসা এল না সে।
এল অনেকক্ষণ পরে।
বাইরে কাঠের পাটাতনের ওপরে ছোট হয়ে বসল টুনি।
সেই নদী।
পুরনো নদী।
আগে যেমনটি ছিল তেমনি আছে।
আজ নদীর জলে হাতের পাতা ডুবিয়ে দিয়ে খেলা করল না টুনি।
উচ্ছল দৃষ্টি মেলে তাকাল না কোনোদিকে।
শুধু বলল, আম্বিয়ারে বিয়া কইরলে এই নাওডা তোমার অইয়া যাইবো না ?
মন্তু সংক্ষেপে বলল, হু।
টুনি বলল, বিয়ার পরে এই বাড়িতে থাইকবা, না আম্বিয়াগো বাড়ি চইলা যাইবা ?
এ কথার কোনো জবাব দিল না মন্তু। সে শুধু দেখল, ঘোমটার ফাঁকে একজোড়া চোখ গভীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।
উত্তর না পেয়ে টুনি আবার বলল, চুপ কইরা রইলা যে ?
মন্তু হঠাৎ দূরে আঙুল দেখিয়ে বলল, শান্তির হাট।
টুনি চমকে তাকাল সেদিকে।
ভাটার স্রোত ঠেলে নৌকাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে শান্তির হাটের দিকে। সারবাঁধা দোকানগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।
সহসা জোরে জোরে দাঁড় টানতে লাগল মন্তু। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল নৌকা। পড়তে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল টুনি। মাথার ওপর থেকে ঘোমটাটা পড়ে যেতে পরক্ষণে সেটা তুলে নিল আবার। মন্তু এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গভীরভাবে কি যেন দেখছে সে।
নৌকাটাকে ঘাটের দিকে এগোতে দেখে টুনি বলল, ঘাটে ভিড়াইতাছ ক্যান, নামবা নাকি ?
মন্তু চুপ করে রইল।
টুনি আবার বলল, হাটে কি কোনো কাম আছে ?

মন্তু মুখখানা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে হঠাৎ মরিয়া গলায় বলল, মনোয়ার হাজিরে কথা দিছিলাম ওর ওইখানে এক রাইতের লাইগা নাইয়র থাকুম। চল যাই।
টুনির দেহটা ধরে কে যেন একটা সজোরে নাড়া দিল। মুহূর্তে চোখজোড়া পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল ওর।
মন্তুর মুখের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে।
মন্তু আবার বলল, মনোয়ার হাজিরে কইলে ও মোল্লা ডাইকা সব ঠিক কইরা দিবো। আবেগে গলাটা কাঁপছে ওর।
টুনির চোখের কোণে তখনও দুফোঁটা জল চিকচিক করছে। অত্যন্ত ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়াল সে। আর অতি চাপা স্বরে ফিসফিস করে বলল, না তা আর অয় না মিয়া। তা অয় না। বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল সে। হাতের বৈঠাটা ছেড়ে দিয়ে বোবা চাউনি মেলে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মন্তু। একটা কথাও আর মুখ দিয়ে বেরুল না ওর।
তারপর।
তারপর নদীর স্রোত বয়ে চলল। কখনো ধীরে কখনো জোরে। কখনো মিষ্টি মধুর ছন্দে।
সেদিন হাটবার। সওদা করে বাড়ি ফিরছে মন্তু। দুই পয়সার পান।
এক আনার তামাক। আর দশ পয়সার বাতাসা।
কার্তিকের শেষে অগ্রহায়ণের শুরু। ঘরে ঘরে ধান উঠছে। অনেক রাত পর্যন্ত কারো চোখে ঘুম থাকে না। কাজ আর কাজ। সারাদিন ধান কেটে এনে পাহারা দিয়ে রাখে। রাতে গরু দিয়ে মাড়ায়। তারপর ঝেড়ে মুছে সব পরিষ্কার করে রাখতে রাখতে রাত অনেক গড়িয়ে পড়ে।
হাট থেকে বাড়ি ফিরে এসে মন্তু দেখে, উঠোনে আসর জমিয়ে বসে পুঁথি পড়ছে সুরত আলীর বড় ছেলেটা। মৃত বাবার এ গুণটি অতি সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছে সে। দূর থেকে শুনলে অনেক সময় বোঝাই যায় না। মনে হয় সুরত আলী বুঝি বসে বসে পুঁথি পড়ছে।

শুন শুন বন্ধুগণরে শুন দিয়া মন।
ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্বজন।

আজ উঠোনে এসে দাঁড়াতে ওদের সবার কথা মনে পড়ল মন্তুর।
বুড়ো মকবুল, রশীদ, আবুল, সুরত আলী।
কেউ নেই।
জীবনের হাটে সকল বেচাকেনা শেষ করে দিয়ে একদিন অকস্মাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ওরা।
টুনির সঙ্গে দেখা হয়নি অনেক বছর।
প্রথম প্রথম খোঁজ খবর নিত। আজকাল সে সময় হয়ে ওঠে না মন্তুর। সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে।
হীরন আজকাল বুড়ো মকবুলের ঘরে থাকে। বহু আগে প্রথম স্বামী তালাক দিয়েছে ওকে। আবার বিয়ে হয়েছিল। বছর তিন চারেক ঘর-সংসার করার পর সেখান থেকেও তালাক পেয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। তারপর আর বিয়ে হয়নি।
আবার ওর একটা ভালো দেখে বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে মন্তু। এখন সে বাড়ির কর্তা। সবার বড়। যেকোনো কাজে সবাই এসে পরামর্শ নেয় ওর।
উঠোনে এসে দাঁড়াতে ওর হাত থেকে পান, তামাক আর বাতাসাগুলো এগিয়ে নিল আম্বিয়া। তারপর কোলের বাচ্চাটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, দুপুর থাইকা কানছে, একটু কোলে নাও।
কোলে নিয়ে ছেলেকে আদর করল সে।
মন্তুকে এগিয়ে আসতে দেখে সবাই পথ ছেড়ে আসরের মাঝখানে বসাল ওকে। এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে এনে ওর হাতে দিয়ে গেল আম্বিয়া। ধীরে ধীরে রাত বাড়তে লাগল। চাঁদ হেলে পড়ল পশ্চিমে।
উঠোনের ছায়াটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল। পরীর দিঘির পাড়ে একটা রাতজাগা পাখির পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ শোনা গেল। সুরত আলীর ছেলেটা তখনো একটানা পুঁথি পড়ে গেল।

কি কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান।
দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরাণ।
আকাশের চন্দ্র যেনরে ভেলুয়া সুন্দরী
দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকুলের পরী।

সুর করে ঢুলে ঢুলে এক মনে পুঁথি পড়ছে সে।
রাত বাড়ছে।
হাজার বছরের পুরনো সেই রাত।

অনুশীলনী

হাজার বছর ধরে

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১ থেকে ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আরে, একবার বিয়া কইরা সম্পত্তিগুলান হাত কইরা নিক। পরে দেহা যাইবো, যদি হাঁপানি হয় তো তালাক দিয়া দিব। মন্তু সহসা কিছু বলল না। সে জানে বিয়ে তাকে করতে হবে। আম্বিয়াকে অনেক ভালো লাগছিল তার। সেদিন যদি বুড়ো মকবুল বলত, তাহলে তক্ষুনি রাজি হয়ে যেত সে। আজ ভাবতে গিয়ে অদূরে দাঁড়ানো টুনির দিকে তাকালো মন্তু।

১. অনুচ্ছেদে প্রথম বাক্যটির বক্তা কে?
- ক. ছমির শেখ
- খ. মকবুল
- গ. নন্তু শেখ
- ঘ. গনু মোল্লা

২. আম্বিয়াকে বিয়ে করতে মন্তুকে আজ ভাবতে হচ্ছে – কারণ
- ক. তার আর্থিক দুরবস্থা
- খ. আম্বিয়া তার যোগ্য নয়
- গ. টুনির কথা চিন্তা করে
- ঘ. আম্বিয়ার অসুস্থতার কথা ভেবে

৩. তুচ্ছ কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার মানসিকতা দূর করার জন্য প্রয়োজন–
- i. নারীজাগরণ ও গণসচেতনতা
- ii. পারিবারিক আইন সংস্কার
- iii. পুরুষদের মনোভাব সংস্কার

নিচের কোনটি সঠিক?
- ক. i ও ii
- খ. ii
- গ. i ও iii
- ঘ. iii

৪. অনুচ্ছেদে বক্তার উক্তিতে তার চরিত্রের কোন দিক তুলে ধরা হয়েছে?
   i. স্বার্থপরতা
   ii. নারী বিদ্বেষ
   iii. প্রতাপ

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i
   খ. i ও ii
   গ. i, ii ও iii
   ঘ. iii

৫. 'রসুনের মতো সাদা-হলুদে মেশানো গায়ের রঙ'– কার সৌন্দর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে?
   ক. আবুলের খালাতো বোন
   খ. আবুলের মামাতো বোন
   গ. ফাতেমার খালাতো বোন
   ঘ. ফাতেমার মামাতো বোন।

৬. "তাল গাছের ডগায় ঝুলানো বাবুই পাখির বাসায়ও কিছুকালের জন্য পরম নিশ্চিন্তে ঘর বেঁধেছিল পুঁটি মাছের ঝাঁক।" –এটি একটি
   ক. উপকথা
   খ. রূপকথা
   গ. জনশ্রুতি
   ঘ. কুসংস্কার

৭. উদ্ধৃতিটি পড় এবং নিচের ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ফসলের দিনে সবাই যখন গরু দিয়ে ধান মাড়ায় তখন তিন বউকে লাগিয়ে ধান মাড়ানোর কাজটা সেরে ফেলে ও। বর্ষা পেরিয়ে গেলে বাড়ির ওপরে যে ছোট জমিটা রয়েছে তাতে তিন বউকে কোদাল হাতে নামিয়ে দেয় মকবুল।

উল্লিখিত ঘটনাটির মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের কোন অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়?
   i. নারী নির্যাতনের
   ii. অভাব অনটনের
   iii. নারীর অসহায়ত্বের

নিচের কোনটি সঠিক ?
   ক. i
   খ. iii
   গ. i ও ii
   ঘ. i ও iii

৮. ‘ফসলের দিন’ বলতে বোঝানো হয়েছে–
ক. আষাঢ়-শ্রাবণ মাস
খ. আশ্বিন-কার্তিক মাস
গ. অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস
ঘ. ফাল্গুন-চৈত্র মাস।

৯. মকবুল গরু দিয়ে ধান মাড়ায় না, স্ত্রীদের দিয়ে মাড়ায়, কারণ সে –
i. মমত্বহীন
ii. দরিদ্র
iii প্রতাপশালী

নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটির আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বউ মারায় একটা পৈশাচিক আনন্দ পায় আবুল। মেরে মেরে দু'দুটো বউকে প্রাণে শেষ করে দিয়েছে সে। প্রথম বউ আয়েশা। স্বামীর প্রচণ্ড মার খেয়েও এতটুকু প্রতিবাদ করেনি। ভেদবমি করে মারা গেছে। দ্বিতীয় বউ জামিলা প্রতিবাদ করতে চেয়েও পারেনি, পরিণামে আরও মার খেয়ে মরতে হয়েছে তাকে। আজকাল তৃতীয় বউ হালিমাকে যখন মারে তখন পরিবারের কেউ কিছু বলে না– কেননা আবুলকে বলার কিছুই থাকে না।

ক. উদ্ধৃতি অংশে সমাজের কোন চিত্র ফুটে উঠেছে?
খ. হালিমাকে নির্যাতিত হতে দেখেও পরিবারের কেউ কিছু বলে না কেন?– ব্যাখ্যা কর।
গ. এই একুশ শতকের প্রেক্ষাপটে আয়েশা ও জামিলার সাথে আজকের নারীসমাজের কী ধরনের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়– আলোচনা কর।
ঘ. অনুচ্ছেদটিতে যে তিনটি নারীচরিত্র আছে তাদের প্রতি আচরণের দিকটি মূল্যায়ন করে তৎকালীন নারীর সামাজিক অবস্থান ব্যাখ্যা কর।

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রঙিন শাড়ি পরে বেরুলে কী হবে, ওদের চিনতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হল না হযরত আলীর। তিনি বুঝতে পারলেন ওরা একজন কলেরা, একজন বসন্ত আর একজন যক্ষা বিবি। মানুষের সর্বনাশ করে বেড়ায় এরা। আর তহনি এক কাণ্ড কইরা বইসলেন তিনি। খপ কইরা মা ওলা বিবির একখানা হাত ধইরা দিলেন জোরে এক আছাড়। আছাড় খাইয়া একখানা পা ভাইঙ্গা গেল ওলা বিবির।

ক. ওলা বিবি কে?
খ. উল্লিখিত তিন বিবি মানুষের যে সর্বনাশ করে তার পরিচয় দাও।
গ. অনুচ্ছেদে যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনশ্রুতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, বর্তমান যুগে তা কতখানি সংস্কারমুক্ত বলে তুমি মনে কর? যৌক্তিকতার সঙ্গে উপস্থাপন কর।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে প্রমাণ কর যে, তৎকালীন সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল।

৩. নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

যার বিয়ে, সেই হীরন রসুই ঘরের দাওয়ায় চুপটি কর বসে রয়েছে– অবাক হয়ে বারবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে দুপুর রাতে পাড়াপড়শিরা অনেকে এল। কাচ্চা–বাচ্চা, ছেলেমেয়ের দল। দুখানা বড় বড় চাটাই বিছিয়ে নিয়ে উঠোনে বসল ওরা। তারপর সবাই একসঙ্গে সুর করে গান ধরল।

"মেহেদি তোমরা লাগ কোন কাজে।
আমরা লাগী দুলহা্ কইন্যারে সাজে।"

ঢেঁকির উপরে তখন আম্বিয়াও গান ধরেছে–

ক. গান গাইল কারা?

খ. অনুচ্ছেদের প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর।

গ. তোমার দেখা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের সঙ্গে অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার তুলনামূলক আলোচনা কর।

ঘ. উল্লিখিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হীরনের বিয়েতে পরিবারের সম্মিলিত ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

কবর

(নাটক)

মুনীর চৌধুরী

কবর

(মঞ্চে কোনোরূপ উজ্জ্বল আলো ব্যবহৃত হইবে না। হারিকেন, প্রদীপ ও দিয়াশলাইয়ের কারসাজিতে নাটকের প্রয়োজনীয় ভয়াবহ, রহস্যময়, অশরীরী পরিবেশকে সৃষ্টি করিতে হইবে।

দৃশ্য : গোরস্থান। সময় : শেষ রাত্রি।

তিন চার ফুট উঁচু একটি পুরু কাল কাপড়ের মজবুত পর্দার দ্বারা মঞ্চটি দুই অংশে বিভক্ত, লম্বালম্বিভাবে নয়, পাশাপাশি। সামনের অংশে কী ঘটিতেছে সবই দেখা যাইবে; কিন্তু বিভক্ত মঞ্চের পশ্চাৎ অংশে কেহ দাঁড়াইলে দর্শকের চোখে পড়িবে না।

পর্দা উঠিলে দেখা যাইবে খালি মঞ্চের ডান কোণে একটি লণ্ঠন টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছে। সামনে একটি মোটা পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ, মুখ খোলা। পাশে একটি ছোট গ্লাস, খালি। একটি রুমাল মাটিতে পাতা রহিয়াছে। মনে হয়, এইমাত্র তাহার উপর কেহ বসিয়াছিল। সেই লোকটিই মঞ্চের ভিতরে আবার ঢুকিল। হৃষ্টপুষ্ট বড়-সড় শরীর। চালচলন গণ্যমান্য নেতার মতো। ভারিক্কী উপযুক্ত সাজগোজ। ভিতরে ঢুকিয়াই আবার ডাকিল -)

নেতা : গার্ড ! গার্ড !

(নীল কোর্তা পাজামা পরা গার্ডের প্রবেশ। পায়ে খয়েরি ক্যাম্বিসের জুতা। পাজামার প্রান্তদেশ মোজার মধ্যে গোঁজা। হাবভাবে প্রভুভক্তির ঝলক, কিন্তু আপাতত একটু হতবুদ্ধি ও ভয়ার্ত ভাব। হাতে নিভন্ত লণ্ঠন। ছুটিয়া প্রবেশ।)

গার্ড : জী হুজুর। *(দ্রুত নিঃশ্বাস)*

নেতা : কী রকম গার্ড দিচ্ছ ? তোমাদের পাহারা দেবার এই নাকি নমুনা ? ছিলে কোথায় এতক্ষণ ?

কতক্ষণ ধরে ডাকছি কোনো সাড়া নেই।

গার্ড : পরথম পরথম ঠাওর করতে পারি নাই হুজুর। এমন ঠান্ডা আর আন্ধার হুজুর যে, কানের মধ্যে খামুখাই কেবল ঝাঁ ঝাঁ করে।

নেতা : তোমার পোস্টিং কোথায় ছিল ?

গার্ড : ঐ পশ্চিম কোণে। ঐ কিনারের শেষ লাল বান্ধানো কবরের পাড়।

নেতা : ওখান থেকে এখানে আসতেই একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছ ? বাহাদুর গার্ড দেখছি। বাতি নিভিয়ে রেখেছ কেন ?

গার্ড : *(চমকাইয়া হাতের লণ্ঠন দেখে)* ওহ্! এ্যা, পইড়া গ্যাছলাম। তাড়াতাড়ি কইরা আইতে গিয়ে পইড়া গ্যাছলাম গর্তের মধ্যে।

নেতা : গর্তে ?

গার্ড : কবর। পুরান কবর হইব। একদম ঠোসা আছিল। না বুইঝা পা দিতেই একদম ভস্ কইরা ভিতরে ঢুইকা গেছি।

নেতা : Idiot ! চোখ মেলে পথ চলো না ? খেলার মাঠ পেয়েছ নাকি ? এটা গোরস্থান। সাবধানে পা ফেলতে

পার না ? যাও। ডিউটিতে যাও।

(অন্যদিক হইতে নিঃশব্দে প্যান্ট-কোট-মাফলার চাদর জড়ানো কিম্ভূতকিমাকার এক ব্যক্তির প্রবেশ। নেতা তাহাকে লক্ষ করে নাই।)

গার্ড : জী হুজুর। *(স্যালুট)*

নেতা : যাওয়ার পথে আবার আরেকটার মধ্যে পোড়ো না। কাতার দেখে আল দিয়ে চলবে। যাও। কোনো কাজ নেই। এমনি ডেকেছিলাম। বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ো।

গার্ড : জী-হুজুর। (স্যালুট ও প্রস্থান।)

ব্যক্তি : (নেতার পেছন হইতে) তখনই বলেছিলাম স্যার এসব আজেবাজে লোক ?

নেতা : *(চমকাইয়া)* কে ? তুমি কে ?

ব্যক্তি : আমি স্যার, ইন্সপেক্টর হাফিজ।

নেতা : ওহ ! আপনি ! এমন করে নাকে-মুখে কাপড় জড়িয়েছেন যে, অন্ধকারে চম্‌কে ওঠেছিলাম। ভবিষ্যতে ওরকম আর করবেন না। না, ভয় পাইনি। গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ভয় কখনই মনে ঢুকতে পারে নি। তবু ডাক্তার বলেছে আমার নাকি হার্ট উইক। সাবধানে থাকতে বলেছে। কী বলছিলেন বলুন- *(বসিয়া গ্লাসটা হাতে লইবে এবং অন্যমনস্কভাবে পোর্ট-ফোলিও ব্যাগটার মুখ খুলিবে।) ইন্সপেক্টর হাফিজ খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু নজর পুরাপুরি নেতার হাতের দিকে।)*

হাফিজ : এই বলছিলাম, এ সব হাবা-গোবা লোক সঙ্গে না আনলেই পারতেন। কাজ বানাবার চেয়ে পণ্ড করাতেই বেটারা বেশি পটু।

নেতা : তা হোক। ওরা আমার বিশ্বাসী লোক। আপনার সারা অফিস ঢুড়লেও অমন লোক জুটত না।

হাফিজ : এটা স্যার ঠিকই বলেছেন। সব একেবারে হারামির বাচ্চা। বেতনটাকে পাওনা দাবি হিসেবে আদায় করতে চায়, নিমক বলে মানে না। এজন্যই তো আজকাল কোনো অফিসেই ফেইথ-ডিসিপ্লিন এগুলো খুঁজে পাবেন না স্যার।

নেতা : হুম্ *(ব্যাগটা আবার দেখেন। চারিদিকে কী যেন খুঁজিতেছেন।)*

হাফিজ : তবু কিছু কাজ আছে স্যার, যা বিবির সামনেও বেপর্দা করতে নেই। তা ছাড়া শহরে কারফিউ লাগানো থাকতে এখানে গার্ডের কোনো দরকার ছিল না। কটাই বা লাশ আর। গোর-খুঁড়েগুলোকে নিয়ে আমি একলাই সব সাফসুফ করে রাখতাম। তার ওপর শীতের মধ্যে আপনি কষ্ট করে ....

নেতা : কিছু কাজ আছে যা অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, তা সে যতই পটু হোক না কেন।*(দাঁড়াইয়া খুঁজিতে থাকে।)*

হাফিজ : কিছু খুঁজছেন স্যার ?

নেতা : হ্যাঁ। একটা বোতল, এ গ্লাসটার পাশেই ছিল। ভূত-জিনে আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করলেও, তারা কেউ এসে একেবারে বোতল সমেত আমার হুইস্কি শেষ করে যাবে–মনে হয় না। একটু আশেপাশে খুঁজে দেখুন তো, আমিই ভুলে কোথাও ফেলে গেছি নাকি।

হাফিজ : ব্যাগের ভেতর পুরে রাখেননি তো ?

নেতা : না। ওগুলো ভরা বোতল। এটা কিছু খালি হয়েছিল।

হাফিজ : ওহ্! তাইতো ! এ-তো বড় সাংঘাতিক কথা ! না না। ভালো করে খুঁজে দেখা দরকার। বোতলটা কী রকম স্যার ?

নেতা : না খেয়ে থাকলে বোঝানো যাবে না।

হাফিজ : না স্যার, মানে স্যার আমি, বোতলটার শেপ্-গড়নের কথা বলছিলাম।

নেতা : ওহ্ খুঁজে দেখুন। আমি নতুন একটা খুলছি, আপনি ওটার খোঁজ করুন।

হাফিজ : *(দর্শকদের দিকে পিছন দিয়া, মেঝের অন্য কোণে উপুড় হইয়া কী খোঁজে। তারপর মাটিতে একবার হাত ঠেকাইয়াই চিৎকার করিয়া উঠে।)* পেয়েছি ! পেয়েছি ! স্যার ! এই যে ! এইটে না স্যার ? *(একটি খালি মদের বোতল তুলিয়া দেখায়।)*

নেতা : অত জোরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠবেন না। গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো দিন ভয় পাইনি, এটা ঠিক। তাহলেও এটা গোরস্থান। খেলার মাঠ নয়। হঠাৎ চেঁচালে বুকে লাগে। আপনাকেও বলেছি একবার। দেখি। হ্যাঁ। বোতল এটাই।

হাফিজ : কিন্তু, মানে, একদম খালি যে স্যার !

নেতা : তাতে ক্ষতি নেই। যে খেয়েছে সে যে বোতলসুদ্ধ সাবাড় করতে সক্ষম নয়, বর্তমানে সেটাই আমাদের জন্য এরকম জায়গায় সুখের কথা। অন্তত ভয়ের কথা নয়।

হাফিজ : ভয় ? কী যে বলেন স্যার। মানে আমি ভেবেছিলাম হয়ত এমনিতেই কারো পায়ের ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে গিয়ে থাকবে। সব হয়ত মাটিতে গড়িয়ে পড়ে বরবাদ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ঐ গার্ড ব্যাটার কাণ্ড। কবরের গর্ত থেকে উঠে এসে সোজা আপনার বোতলের ওপরই হয়ত আবার হোঁচট খেয়েছে। অমন দামি জিনিসটা নষ্ট করে দিল স্যার !

নেতা : আপনাকে প্রথম ভেবেছিলাম নেহায়েৎ সরকারি কর্মচারী। এত দরদি লোক বুঝিনি।

হাফিজ : সব মাটিতেই পড়েছে স্যার। হাত দিয়ে দেখলাম। জায়গাটা ভিজে একেবারে কাদা কাদা হয়ে গেছে।

নেতা : আপনার এ চাকরি নেওয়া সার্থক হয়েছে। এবার একটু বসে আরাম করুন। ভয়ংকর ঠান্ডা। আপনার পা সুদ্ধ কাঁপছে।

হাফিজ : অ্যা ! পা ? টলছে–মানে, কাঁপছে ? ওহ্ ! হ্যাঁ, তাইতো, ইস্ কী বেজায় শীত। একটু বসি তাহলে স্যার, এ্যা ? *(নেতা তখন হোৎকা পোর্টফোলিও ব্যাগ হইতে নতুন বোতল খুলিয়া ক্রমাগত ঢালিতেছেন।)*

নেতা : ওদিককার কাজ কতদূর এগুলো ? আর কতক্ষণ দেরি হবে ?

হাফিজ : প্রায় হয়ে এল বলে। এতক্ষণে সব চুকে দু-একটা বেজে যেত। গোলমালে কাজে বাধা না পড়লে-কখন সব শেষ করে ফেলতাম–

নেতা : গোলমাল ! এখানেও গোলমাল ? গোরস্থানের মুর্দারাও মিছিল করতে শিখেছে নাকি ?

হাফিজ : কী যে বলেন স্যার ! ঐ গোর-খুঁড়েগুলো দু-একটা আপত্তি তুলেছিল, সেটা মেটাতে একটু দেরি হয়ে গেল।

নেতা : আপত্তি ? টাকা-পয়সা নিয়ে আপনি কোনো গোলমাল করেননি তো ? আপনাকেও বলেছি যে, টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। যা দরকার তার চেয়েও বেশি ছড়িয়ে যান। সরকারের অনুমোদন আমি যোগাড় করে দেব। টাকা ঢালতে আপনার কষ্ট হয় কেন ? কমতি পড়লে আপনি আমার কাছে চেয়ে নিতেন।

হাফিজ : সে কি স্যার আমি বুঝিনি ? সরকারের কাজে সরকারি টাকা খরচ করতে আমি পেছ-পা হব কেন ? তবে ঐ ছোটলোকগুলোর আবার অদ্ভুত সব ধর্মীয় কুসংস্কার রয়েছে কিনা তাতেই যত ফ্যাঁকড়া বাধে। মুজুরি তো ষোল আনা আদায় করবেই, তার ওপর ধর্মের নাম করে সাত রকম ফষ্টিনষ্টি। কুসংস্কারই দেশটাকে খেল স্যার !

নেতা : আমার বক্তৃতা আমাকে শোনাবেন না। আসলে কী ঘটেছে তাই বলুন।

হাফিজ : হাসপাতাল থেকে লাশগুলো তাড়াহুড়ো করে টেনেহেঁচড়ে গাড়িতে তুলতে হয়েছে। তার ওপর এতখানি পথ ট্রাকে আনা, ঝাঁকুনি কিছু কম খায়নি। আর ডাক্তারগুলোও যেমন পশু, মড়াগুলোকে কেটে-কুটে একেবারে নাশ করে রেখেছিল।

নেতা : এসব কাজে নার্ভাস হলে এত বড় প্রতিষ্ঠানের নেতা হতে পারতাম না। তবু আপনাকে বলেছি আমার হার্ট একটু উইক। বেশি স্ট্রেইন সহ্য হয় না। বাজে কথা না ঘেঁটে আসল কথাটা বলুন।

হাফিজ : যা হবার তাই হয়েছে। টানা-হেঁচড়ায় আর ট্রাকের ঝাঁকুনিতে গাড়ির মধ্যেই লাশগুলো একেবারে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। কাটা টুকরাগুলো এলোমেলো হয়ে যাওয়ায় এখন আর বোঝবার উপায় নেই, কোনটার সঙ্গে কোন্‌টা যাবে।

নেতা : তাতে কী হয়েছে ? *(নতুন বোতল খুলিবে)*

হাফিজ : আরেকটা খাচ্ছেন স্যার ? মানে, তাই দেখে আমি গোর-খুঁড়েগুলোকে বললাম, আলাদা আলাদা করে অতগুলো কবর বানিয়ে কী দরকার। একটা বড়-মতোন গর্ত করে সবগুলো তার মধ্যে ঠেসেঠুসে পুরে মাটি চাপা দিয়ে দিলেই হয়।

নেতা : Resourceful officer ! আপনার নামটা মনে রাখতে হবে। সকাল বেলায়ই একবার পার্টি হাউসে আসবেন, রিকমেন্ডেশন লিখে দেব।

হাফিজ : মেহেরবানি স্যার। পাকিস্তান হবার পর আমরা পেটি-অফিসাররাই কেবল কিছু পেলাম না। বৃটিশ আমলেও সমাজে মিশতে পারিনি। পাকিস্তানের জন্য এত ফাইট করে আমাদের এখনও সেই দশা। যদি আপনারাও আমাদের দিকে ফিরে না তাকান আমরা বাঁচব কী করে ? আমাদের তো কোনো রাজনীতি নেই স্যার ! সরকারই মা-বাপ ! যখন যে দল হুকুমত চালায় তার হুকুমই তামিল করি।

নেতা : এর মধ্যে গোলমালটা কিসের ? আপত্তি উঠল কোথায় ?

হাফিজ : এ্যা ? ওহ্‌। ইয়ে-মানে, ঐ গোর-খুঁড়ে। বজ্জাত ব্যাটারা বলে কিনা 'কভি নেহি'। বলে কিনা 'মুসলমানের মুর্দা, দাফন নেই, কাফন নেই, জানাজা নেই? তার ওপর একটা আলাদা কবর পর্যন্ত পাবে না ? এ হতে পারে না, কভি নেহি।' গো ধরে বসে রইল। কত বোঝালাম।

নেতা : আহাম্মকি করেছেন। সরকারি কাজ করেন কিনা ! পাবলিক সেন্টিমেন্ট বোঝেন না। বোঝাতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে ওদের খুশিমতো কাজ করতে দিলে আপনার ইজ্জত ডুবত ? কাজ আদায় করা নিয়ে আপনার কারবার। সমাজ সংস্কারের বক্তৃতা দেবার জন্য আপনাকে সরকার বেতন দেয় না। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আকাশ ফরসা হয়ে যাবে–আযান পড়বে–কারফিউ শেষ হবে। লাশগুলো

নিয়ে আপনি এখনও মিটিং করছেন ?

হাফিজ : আমি সঙ্গে সঙ্গে ওদের কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলাম।

নেতা : তাহলে এতক্ষণ দেরি হচ্ছে কেন ?

হাফিজ : ঐ তখনই তো স্যার আরেকটা নতুন ফ্যাঁকড়া বাধল। কোথ্থেকে ছুটে এসে ঐ মুর্দা ফকির চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল।

নেতা : কে ? আপনাকে এতবার করে বলেছি, দম্‌কা দম্‌কা একেকটা উদ্ভট কথা আমাকে বলবেন না। ধড়াক করে বুকে লাগে ! যা বলবার তা অত নাটক করে টিপে টিপে না বলে খোলাখুলি প্রথমেই সবটা বলে ফেলতে পারেন না ? (বুকে হাত বুলাইয়া) এই মুর্দা ফকিরটি কে আবার ? কবর ফুঁড়ে বেরিয়েছে নাকি? কারফিউর মধ্যে এখানে ঢুকল কী করে ? গার্ডগুলো কী করছিল ?

হাফিজ : এখানেই থাকে স্যার। গোরস্থানের বাইরে কখনও যায় না বলেই তো ওই নাম। দিনরাত এখানেই পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে কবরের সঙ্গে আলাপ করে। পাগল ! বদ্ধ পাগল !

নেতা : হুম !

হাফিজ : লোকটা এমনিতেই ভালো লেখা পড়া জানে। ভালো আলেম। গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করত। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে চোখের সামনে ছেলে-মেয়ে, মা-বৌকে মরতে দেখেছে। কিন্তু কাউকে কবরে যেতে দেখেনি। মুর্দাগুলো পচেছে। শকুনে খুবলে দিয়েছে। রাতের বেলায় শেয়াল এসে টেনে নিয়ে গেছে। সেই থেকে পাগল। গোরস্থান থেকে কিছুতেই নড়তে চায় না। বলে, মরে গেলে কেউ যদি কবর না দেয়। মরার সময় হলে, কাছাকাছি থাকব, চট করে যাতে কবরে ঢুকে পড়তে পারি। বড় ট্রাজিক স্যার !

নেতা : অনেক খবর রাখেন দেখছি।

হাফিজ : চাকরি। চাকরি স্যার। চারদিকের হরেক রকমের খোঁজ আমাদের রাখতে হয় স্যার।

নেতা : বেশি খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে নিজের বুদ্ধিটাই কোথায় যেন খুইয়ে এসেছেন। মেহেরবানি করে তাড়াতাড়ি বলবেন কি, গোলমালটা কিসের ? লাশগুলো মাটিচাপা দিতে এত দেরি হচ্ছে কেন ? ঠান্ডায় আপনার মগজ জমে গেছে। কেবল এলোমেলো বকছেন। নিন। *(বোতলটা আগাইয়া দিয়া)* এক চুমুক টেনে নিন। শরীর গরম হবে। বুকে সাহস পাবেন। কথা গুছিয়ে বলতে পারবেন। নিন।

হাফিজ : আপনার সামনে স্যার ? তার ওপর স্যার এখন অন ডিউটি—

নেতা : তাকানোর সময় নেই। লাশগুলো মাটিচাপা দিয়ে কারফিউ শেষ হবার আগে আমাদের এখান থেকে সরে পড়তে হবে। টিলেমির এটা সময় নয়। ধরুন। এক চুমুক টেনে চট্‌পট্‌ কাজটা শেষ করে ফেলুন।

হাফিজ : বোতলে মুখ লাগিয়ে খাব স্যার ?

নেতা : কেন, চুসনি লাগিয়ে দিতে হবে নাকি ?

(হাফিজ বোতলটা মুখে লাগাইয়া চোঁ চোঁ করিয়া টানে টানে একদম খালি করিয়া ফেলিল। ঢক্‌ করিয়া বোতলটা মাটিতে রাখিয়া চোখ বড় করিয়া এক মুহূর্ত থম্‌ ধরিয়া থাকে। তারপর আকর্ণ বিস্তৃত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া—)

হাফিজ : এই মালটা স্যার আরও ভালো। একেবারে কলজেয় গিয়ে ঘা মারে।

নেতা : মুর্দা-ফকির লাশগুলো দেখেছে ?

হাফিজ : এ্যা ! ওহ্ হ্যাঁ, মানে, না। বোধ হয় দেখেনি। ও ব্যাটার চলাফেরা কিছু ঠাওর করা যায় না। কোথ্থেকে হঠাৎ হুস্ করে একেবারে সামনে এসে পড়ে। বোধ হয় আড়াল থেকে গোর-খুঁড়েদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা শুনে থাকবে। আচমকা পেছন থেকে লাফিয়ে পড়ল। ঠিক আমাদের মাঝখানে। তারপর কী তুখোড় বক্তৃতা। আমি তো গোর-খুঁড়েদের কথা মেনেই নিয়েছিলাম। এ-ব্যাটাই না কোথ্থেকে উড়ে এসে ওদের বোঝাতে শুরু করল : কিছুতেই না, একটা কবরেই কাজ সারতে হবে। যে হারে মানুষ মরছে তাতে নাকি শেষটায় ওর কবরের বাজারে ঘাটতি পড়ে যেতে পারে। দেখুন তো কী সব বিদঘুটে কথা !

নেতা : ওকে সুদ্ধ পুঁতে ফেললেন না কেন ?

হাফিজ : কী যে বলেন স্যার। মন ভুলিয়ে কাজ আদায় হলে জানে মেরে ফয়দা কী ? পাগলা আদমি, একটু তাল দিয়ে কথা বলতেই শুড় শুড় করে আমার সঙ্গে চলে এল। ওকে ওই দিকে পার করে দিয়ে আমি পাহারা দিচ্ছিলাম, যেন আবার হামলা না করে। আর এই শালারাও সেই কখন থেকে শাবল চালাচ্ছে, এখনও নাকি খোঁড়াই শেষ হল না। *(ঘড়ি দেখিয়া)* এতক্ষণে নিশ্চয়ই প্রায় হয়ে এসেছে।

নেতা : *(গ্লাসে চুমুক দিয়া)* না। কাজটা ঠিক হয়নি। এসব ফকির দরবেশ বড় ধড়িবাজ লোক হয়। কোথ্থেকে কী উৎপাত সৃষ্টি করবে কে জানে।

হাফিজ : লাশ ও ব্যাটা দেখেনি। দেখলেও কিছু বুঝতে পারত না। রক্ত-মাংসের স্তূপ দেখে ও কী বুঝবে ? এ রকম লাশ তো ট্রেনে-চাপা মড়ারও হতে পারে।

নেতা : গুলি চলছে দুপুর বেলা। খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে, এফোঁড়-ওফোঁড়। ফকির হোক পাগল হোক–শহরে থেকেও এ খবর ওর কানে পৌঁছেনি, তা ভাবতে আমি রাজি নই। এসব খবর ঝড়ো হাওয়ার মুখে আগুনের ফুলকির মতো ছড়িয়ে পড়ে।

হাফিজ : মুর্দা-ফকির ঝড়ও বোঝে না, আগুনও বোঝে না। ওতো এক রকম কবরের বাসিন্দা। ভাষার দাবিতে মিছিল বেরিয়েছিল বলে পুলিশ গুলি করে কয়েকটাকে খতম করে দিয়েছে–এত কথা বোঝবার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি ওর নেই। লাশ দেখলেই ও মুখের মধ্যে ভাত গুঁজে দিতে চায়–কারণ ওর ধারণা, মানুষ শুধু এক রকমেই মরতে পারে-খেতে না পেয়ে। পাগল, বদ্ধ পাগল !

নেতা : কিন্তু লাশগুলোকে কোথায় কবর দেওয়া হচ্ছে তা তো ও দেখেছে। সকাল বেলা যদি কাউকে আঙ্গুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দেয় ? লাশ নিয়ে মিছিল করতে না পেরে ক্ষেপে গিয়ে সকাল বেলা যদি ছাত্ররা এখানেও খোঁজ করতে আসে ?

হাফিজ : আপনারা লিডার। অনেক দূর ভাবেন। আমরা পেটি অফিসার, হুকুম তামিল করেই খালাস। কী করতে হবে ? (স্তব্ধতা)

নেতা : ওটাকে সুদ্ধ পুঁতে দাও।

হাফিজ : এ্যা ? কী বলছেন স্যার ? আপনি এক্সাইটেড হয়ে গেছেন স্যার। আর খাবেন না এখন।

নেতা : আমার মাত্রা আমি জানি। পুঁতে ফেল। দশ-পনের-বিশ-পঁচিশ হাত। যত নিচে পার। একেবারে পাতাল পর্যন্ত খুঁড়তে বলে দাও। পাথর দিয়ে, মাটি দিয়ে, ভরাট করে গেঁথে ফেল। কোনোদিন যেন আর ওপরে উঠতে না পারে। কেউ যেন টেনে ওপরে তুলতে না পারে। যেন মিছিল করতে না পারে, স্লোগান তুলতে না পারে, যেন চ্যাঁচাতে ভুলে যায়।

হাফিজ : আপনি বড় এক্সাইটেড স্যার। এ-সব কাজ বড় সূক্ষ্ম স্যার। এক্সাইটমেন্ট সব পণ্ড করে দিতে পারে। আমাদের ট্রেনিংই এ জন্য অন্যরকম। কোনো সময়ই আমাদের উত্তেজিত হতে নেই। ভান

করতে পারি কিন্তু আসলে উত্তেজিত নই।

নেতা : পুঁতে ফেল।

হাফিজ : ভুল, খুব ভুল হবে। যা-ই করতে হয় স্যার খুব কুল্‌লি করতে হবে। এসব আমাদের রীতিমত প্রাকটিস করে আয়ত্ত করতে হয়েছে। এতে কাজ হয়। আমি একবার ঐ দিকটা দেখে আসি। এত দেরি হচ্ছে কেন বুঝতে পাচ্ছি না।

নেতা : যান, তাড়াতাড়ি যান। আপনার কথা শুনতে শুনতে কানে তালা লেগে গেছে। নেশাটা পর্যন্ত জমতে পারছে না। আর বেশিক্ষণ আপনাকে দেখলে, আপনাকে সুদ্ধ পুঁতে ফেলতে ইচ্ছে হবে।

হাফিজ : এ্যা ! ওহ্‌-হে হে হে ! আপনার কথা শুনলে হাসি পায় ঠিক-কিন্তু, মানে পিলে পর্যন্ত চমকে ওঠে স্যার। বুকটা ধড়ফড় করে উঠেছে। উঠতে গিয়ে মনে হল যেন পড়ে যাব। বড্ডো ভয় পেয়ে গেছি স্যার। আরেকটু দেবেন স্যার ? খেলে একটু মনে সাহস আসবে। তাড়াতাড়ি গুছিয়ে কাজ করতে পারব। এই নতুন বোতলটা কেমন স্যার ?

নেতা : *(চোখ তুলিয়া)* আপনার মাত্রা আমার জানা নেই। এই দফায় একটু কমিয়ে দিলাম। *(গ্লাসে কিছুটা ঢালিয়া বোতলটা তুলিয়া দিলেন।)*

(নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে মুর্দা ফকির। কেহ তাহাকে দেখে নাই। সর্বাঙ্গ কম্বলে ঢাকা। রুক্ষ ময়লা চুল। তীক্ষ্ণ কোটরাগত চক্ষু জ্বলিতেছে। হাফিজ ও নেতা বোতল ও গ্লাস চুমুকে শেষ করিয়াছে।)

ফকির : *(হাফিজের কাঁধে হাত দিয়া)* ঝুঁটা! *(হাফিজ ও নেতা সভয়ে চিৎকার করিয়া উঠে। নেতা দুর্বল হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরে।)*

নেতা : কে ?

হাফিজ : এ্যা ! ওহ্‌ আপনি ? হঠাৎ অন্ধকারে চিনতে পারিনি হুজুর।

ফকির : ঝুঁটা। মিথ্যেবাদী। আমাকে চিনতে পারে না। এ গোরস্থানে এমন কেউ নেই। জিন্দা-মুর্দা কেউ না। জিন্দা আর মুর্দায় পার্থক্য বোঝ ? দেখলে চিনতে পারবে ?

হাফিজ : সে হুজুর আপনার দোয়ায়।

ফকির : ঝুঁটা ! তুমি কোনো পার্থক্য বোঝ না, কিচ্ছু চেন না। তুমি বাঁচার না-লায়েক। তোমার মতো জিন্দা আদমিকে কেউ দোয়া করে না। পাগলেও না। তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। আমি ওদের ভালো করে দেখেছি, ওরা মুর্দা নয়। মরেনি। মরবে না। ওরা কখনও কবরে যাবে না। কবরের নিচে ওরা কেউ থাকবে না । উঠে চলে আসবে।

হাফিজ : আপনি তো এইদিকে ছিলেন। ওদিকে গেলেন কখন ?

ফকির : বাবা ! তোমরা শহরের অলি-গলি যেমন চেন, এ গোরস্থান আমার তেমনি চেনা। এখানে কবরের নিচ দিয়ে সুড়ং আছে। আমি তৈরি করেছি। নইলে তোমাদের সঙ্গে পারব কেন ?

হাফিজ : হো হো হো। আপনি বড় মজার কথা বলেছেন হুজুর।

ফকির : এই তো ঠিক বুঝতে পেরেছ বাবা। তুমি আমায় ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে। ভেবেছিলে পাসপোর্ট না করিয়েই ওপার চালান করে দেবে। পরীক্ষা না করে কি আর আমি এমনি যেতে দি !

হাফিজ : সালাম হুজুর। আপনি বুঝি এখানকার পাসপোর্ট অফিসার ? মাফ করে দিন হুজুর, এতক্ষণ চিনতে পারিনি।

ফকির : সাবাস বেটা। তোর নজর খুলছে।

হাফিজ : তা হুজুর এখন অনুমতি দিন, ওদের পার করে দি।

ফকির : না। আমি প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম একটা কিছু গোলমাল নিশ্চয়ই আছে। তাই না চুপে চুপে সুড়ং দিয়ে ঢুকে এক্কেবারে তোদের ঢাকা মোটর গাড়ির ভেতর গিয়ে উঠলাম।

নেতা : ইন্সপেক্টর !

ফকির : প্রথমে দেখে মনে হল ঠিকই আছে। উল্টেপাল্টে দেখি, কোনোটার বুকের কাছে এক খাবলা গোশ্‌ত নেই, কোনোটার ফাটা খুলি দিয়ে কী সব গড়িয়ে পড়ছে, ভাবলাম ঠিকই আছে। কবরের কাবেল। কিছু নয়, শেয়াল-শকুনে খামচে কামড়ে একটু খারাপ করে গেছে। তারপর হঠাৎ খেয়াল করে দেখি–না তো, ঠিক তো নেই। উহুম্‌।

হাফিজ : সে কি হুজুর। ঠিক। সব তো ঠিকই আছে।

ফকির : চোপরও। ঠিক নেই। গন্ধ ঠিক নেই। তোমরা চোরাকারবারি। আমি শুঁকে দেখেছি, গন্ধ ঠিক নেই।

হাফিজ : গন্ধ ?

ফকির : বাসি মড়ার গন্ধ আমি চিনি না ? এ লাশের গন্ধ অন্য রকম। ওষুধের, গ্যাসের, বারুদের গন্ধ। এ মুর্দা কবরে থাকবে না। বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ হাত যত নিচেই মাটি চাপা দাও না কেন- এ মুর্দা থাকবে না। কবর ভেঙে বেরিয়ে চলে আসবে। উঠে আসবে।

হাফিজ : ওহ্‌ ! তাহলে বলুন, কবর দেওয়া হয়ে গেছে। থাক। গন্ধ থাকুক। মাটির নিচ থেকে নাকে লাগবে না।

ফকির : ওরা জোর করে কবর দিয়ে দিল। আমায়ও বলল না। আমিও তোমাদের কথা মানবো না। ও মুর্দা কবরের নয়। আমি ওদের ডেকে তুলে নিয়ে চললাম।

হাফিজ : খোদা হাফেজ।

(ফকির কিছুদূর যাইয়া আবার ফিরিয়া আসে। টানিয়া টানিয়া চারিদিক হইতে কী শুঁকিতে চেষ্টা করে। নিজের শরীরও শুঁকিয়া দেখে।)

ফকির : নাহ্‌, আমার গায়ের গন্ধ নয়। দেখি-*(আগাইয়া আসিয়া একবার হাফিজের গা শুঁকিবে। তারপর ঝুঁকিয়া হাফিজের মুখের ঘ্রাণ নিয়াই জ্বলজ্বলে চোখ বিস্ফোরিত করিয়া দেয়। ছুটিয়া নেতার মুখের ঘ্রাণ নেয়। মুখ-চোখ অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া)* উহ্‌ ! তাই বল ! এইবার পেয়েছি। ব্যাটারা কী ভুলই না করেছে।

নেতা : ইন্সপেক্টর, লোকটাকে দূর করে দাও এখান থেকে।

ফকির : গন্ধ ! তোমাদের গায়ে মরা মানুষের গন্ধ ! তোমরা এখানে কী করছ ? যাও, তাড়াতাড়ি কবরে যাও। ফাঁকি দিয়ে ওদের পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা বাইরে থেকে মজা লুটতে চাও, না ? না, না। আমার রাজ্যে এসব চলবে না। *(গন্ধ শুঁকে)* তোমাদের গায়ে মুখে পাই মড়ার গন্ধ। তোমাদের সময় হয়ে গেছে। ছিঃ, এরকম ফাঁকি দেয় না । আমি ওদের তুলে নিয়ে আসছি, তোমরা তৈরি হয়ে নাও। ইস্‌ ! গোর-খুঁড়েরা কী ভুলই না করেছে ! না, না এ তো হতে পারে না–

(বিড়বিড় করিতে করিতে ফকিরের প্রস্থান। মঞ্চে বিমূঢ় নেতা। হাফিজ হাসিতেছে। প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া লইতেছে। সাফল্যের হাসি। পানাধিক্য হেতু কিঞ্চিৎ বেসামাল।)

হাফিজ : হে হে হে হে স্যার। সব খতম স্যার। আমরা এখন ফ্রি। দেখলেন তো, পাগলটাকে কী রকম পোষ মানালাম। পাগলটাকে অত হুজুর হুজুর না বললে হয়ত গাঁয়ের দিকেই ছুটত। আর শরীরটা অনেকক্ষণ থেকেই এমন নড়বড়ে মনে হচ্ছে যে, এর ওপর এখন কিছু এসে পড়লে পাত্তা পাওয়া যেত না।

নেতা : ভালো হত। তুলে নিয়ে আপনাকে সুদ্ধ পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করতাম।

হাফিজ : ঐ একটা নোংরা কথা বারবার বলবেন না, স্যার। তাহলে আমিও আপনার সম্পর্কে দুএকটা হক কথা বলে ফেলব কিন্তু।

নেতা : যেমন ?

হাফিজ : যেমন ? বেশ। একটা বলছি। আমাকে তুলে নিয়ে যাবার মতো ক্ষমতা বা অবস্থা আপনার এখন নেই। আপনি এখন নিজেকে নিজে খাড়া রাখতে পারলেই প্রচুর হাততালি পাবেন। বক্তৃতা না করলেও হাততালি দেব।

নেতা : মারহাবা ! সাবাস ! খুব ধরেছেন। ডিপার্টমেন্টের মুখ উজ্জ্বল করবেন একদিন। একবারও তো ঠিক মতো উঠে দাঁড়াইনি, ধরে ফেললেন কী করে ?

হাফিজ : অনেক দিন হল এ লাইনে আছি স্যার, এতটুকু বুঝব না ?

নেতা : সবটা ঠিক ধরতে পারেননি। উঠতে হয়ত কষ্ট হবে, কিন্তু বক্তৃতা আমি ঠিক দিতে পারব। কী, বিশ্বাস হয় না বুঝি ?

হাফিজ : বিশ্বাস ? হ্যাঁ ! পারবেন। তা পারবেন। আমি, আমি মানে আমার ব্রেনটাও ঠিক আছে। যেকোনো পরিস্থিতিতে এখনও আমার ডিউটি ঠিক করে যেতে পারব। তবে, তবে মানে এই চোখ, আর কান খামোখাই একটু বেশি কাজ করছে বলে ভয় হচ্ছে।

নেতা : ভয় ? ভয় কিসের ? তুমি মনে করেছ ঐ মুর্দা ফকিরের কথায় আমি ডরাই ? এখান থেকে যাওয়ার আগে ওটাকে মুর্দা বানিয়েই যাব। কোথাকার আমার জিন্দা পীর এসেছেন–ওর কথায় গোর থেকে লাশ উঠে আসবে।

হাফিজ : কিছু মনে করবেন না স্যার। একটা সওয়াল পুছ করছি আপনাকে। মনে করেন, সত্যি যদি ঐ মুর্দা ফকির লাশগুলোর একটা মিছিল নিয়ে এসে দাঁড়ায়-কী করবেন তখন আপনি ?

নেতা : সব্বাইকে, আপনাকে সুদ্ধ, একসঙ্গে পুঁতে ফেলতাম।

হাফিজ : আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে রসিকতা করিনি। ঐ মুর্দা ফকির শুনেছি অনেক কিছু জানে। কিন্তু যদি আসেও, আমি ভয় পাই না। একটুও না। প্রথমে হাসব। দেখব। এগিয়ে যাব। হাত মেলাবো। ভয় কিছুতেই পাব না। *(নিজের গলা দুই হাতে সজোরে টিপিয়া ধরিয়া)* গ...লা টিপে ধরে রাখব। যাতে বুকের মধ্যে ভ....য় কিছুতেই ঢুকতে না পারে। আরেকটু দেবেন স্যার ? বুকে সাহস আসবে। কেমন জানি ইয়ে করছে।

(ততক্ষণে পার্টিশানের ঐ পাশ হইতে সকলের অলক্ষে ক্রমোজ্জ্বলিত আলোকশিখার কম্পিত গোলকের মধ্যে একটি ভয়াবহ মুখ ভাসিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত বদনমণ্ডল পরিবেষ্টিত করিয়া রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ। মূর্তি নিশ্চল। নেতা যখন শেষবারের মতো ইন্সপেক্টরকে পানীয় দিবার জন্য গ্লাসে বোতল উপুড় করিয়া ধরিয়াছেন, তখন ঐ স্তব্ধ মূর্তির একটি প্রায় অদৃশ্য হাত অন্ধকার হইতে কী যেন ছুঁড়িয়া মারিল। কাচের গ্লাসের ঝন্ ঝন্ শব্দ। নেতা ও হাফিজের ভয়ার্ত অস্ফুট চিৎকার।)

হাফিজ : গুলি ! গুলি স্যার ! শুয়ে পড়ুন শিগগির ! গুলি !

(দুইজনে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ে। পশ্চাতে কম্পিত শিখায় নিস্পন্দ মুখ। কয়েক মুহূর্তের সুতীব্র স্তব্ধতা।)

নেতা : *(চাপা স্বরে)* গুলি যে বুঝলে কী করে ?

হাফিজ : দেখেছি !

নেতা : কে ছুঁড়েছে তুমি দেখেছ ?

হাফিজ : না। তবে কী ছুঁড়েছে দেখেছি।

নেতা : কোথায় ?

হাফিজ : বেশি নড়বেন না। খুঁজে দেখছি পাই কিনা। *(উপুড় হইয়া একটু চারিদিকে হাতড়ায়। হঠাৎ কী তুলিয়া দেখে)* ধরুন, পেয়েছি।

নেতা : *(হাতে লইয়া)* এ কী ? এ যে বুলেট ! রক্তমাখা !

হাফিজ : কুল্‌লি ! কুল্‌লি ! ভয় পাবেন না স্যার। ভয় পেলেই সব গেল। এ নিশ্চয়ই ঐ মুর্দা ফকিরের কাণ্ড। ট্রাকের ভেতর ঢুকে লাশের গা থেকে হয়ত খুলে নিয়ে এসেছে। সেগুলোই ছুঁড়ে মেরে এখন আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।

নেতা : ও ! তাহলে বল– কিছু না। মুর্দা ফকির-সে তো জ্যান্ত আদমি। বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

হাফিজ : এখন উঠে পড়া যাক স্যার। মিছেমিছি ভয় পেয়ে লাভ কী !

নেতা : ইন্সপেক্টর !

হাফিজ : জী।

নেতা : আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে–যে মেরেছে, সে এখনও আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাফিজ : এ্যাঁ !

নেতা : তুমি একটু ঘুরে একবার দেখ তো। আমিও তাকাচ্ছি।

হাফিজ : *(ধীরে মাথা ঘুরাইয়া দেখে সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। আপ্রাণ চেষ্টায় অস্বাভাবিক স্থি'র কণ্ঠে)* উঠে এসেছে।

নেতা : কে ?

হাফিজ : সেই লাশটা।

নেতা : লাশ ! কোন লাশটা ?

হাফিজ : বুলেট খাওয়া। ছাত্র। খুলি নেই।

নেতা : ওহ্ ! কী চায় ?

হাফিজ : চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করে দেখব ?

নেতা : কী জিজ্ঞেস করবে ?

হাফিজ : এই, কী চায়, কেন উঠে এসেছে, ঠান্ডা লাগছে নাকি–এই সব ?

নেতা : আমাদের কথা বুঝবে ?

হাফিজ : ট্রাই করতে হবে। সব লাইনেই ট্রাই করতে হবে। এটা একটা নতুন সিচুয়েশান স্যার। কুল্‌লি অগ্রসর হতে হবে। ঘটনা হিসেবে এটা অবাস্তব হতে বাধ্য। কিন্তু, অন্য রকম হলেও আমাদের ভয় পেলে চলবে না। ফেইস করতেই হবে। *(উঠিয়া দাঁড়াইবে। বেশ কষ্ট। নাটুকে মাতালের টলায়মান অবস্থা নয়, তবে নেশা যে উভয়েরই খুব গাঢ় হইয়াছে তাহা স্পষ্ট।)*

নেতা : আপনি কিছু ভয় পাবেন না। আমি পেছনে রয়েছি। পিস্তলের টিপ আমার পাকা।

হাফিজ : খবরদার। অমন কাজও করবেন না। *(ফিস্‌ফিস্ করিয়া)* পিস্তলের কেস এটা নয় স্যার। বুঝতে পারছেন না-এটা-ঠিক মানে, অন্য জিনিস, মানুষ নয়। পিস্তল রেখে দিন। লক্ষ করুন, আমি কী রকম সামলে নিচ্ছি। একটু আলাপ করতে পারলেই পোষ মানিয়ে নেব। *(ধীরে ধীরে আগাইয়া মূর্তির নিকট আসে। বাতাসে টানিয়া টানিয়া স্পর্শ করিতে চেষ্টা করে।)* এই ! এই ! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ? এই ! হেই ! *(মূর্তি নীরব। নিশ্চল।) (ঘুরিয়া)* স্যার, কোনো সাড়া দিচ্ছে না যে ?

নেতা : বোধ হয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। আমাদের সঙ্গে হয়ত কোনো কাজ নেই। ভালো। তা ভালো। ও থাকুক। আমরা চল আমাদের কাজে যাই।

হাফিজ : তা হয় না স্যার। ওকে এখানে দাঁড় করিয়ে আমরা চলে যাব ? তা হয় না স্যার। আমার ডিউটি আমাকে করতেই হবে। ওকে ফেরত না পাঠিয়ে আমরা চলে যেতে পারি না, স্যার।

মূর্তি : আমি যাব না। আমি থাকব। (দু'জনে হতবাক। ধীরে ধীরে হাফিজ আগাইয়া যায়।)

হাফিজ : কোথায় যাবে না ? কোথায় থাকবে ?

মূর্তি : কবরে যাব না। এখানে থাকব।

হাফিজ : অবুঝের মতো কথা বল না। তোমাদের এখন এখানে আর থাকতে নেই। তোমরা মরে গেছ। অন্যখানে তোমাদের জন্য নতুন জায়গা ঠিক হয়ে গেছে। সেখানেই এখন তোমাদের চলে যাওয়া উচিত।

মূর্তি : মিথ্যে কথা। আমরা মরিনি। আমরা মরতে চাইনি। আমরা মরব না।

হাফিজ : *(নেতার কাছে আসিয়া)* বড় একগুঁয়ে স্যার। আলাপ করে সুবিধে হবে, মনে হচ্ছে না। একটা বক্তৃতা দিয়ে দেখবেন স্যার ? যদি কিছু আছর হয়। পারবেন না স্যার ? আপনি তো বলেছিলেন– যাই হোক–বক্তৃতা দিতে আপনার কোনো কষ্ট হবে না। একবার ট্রাই করুন না স্যার।

নেতা : *(ভালো করিয়া শুনিয়া)* দেখ ছেলে, আমার বয়স হয়েছে। তোমার মুরুব্বিরাও আমাকে মানে। বহুকাল থেকে এ দেশের রাজনীতি আঙুলে টিপে টিপে গড়েছি, শেপ দিয়েছি। কওমের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের, বলতে পার, আমিই একচ্ছত্র মালিক। কোটি কোটি লোক আমার হুকুমে ওঠে, বসে–

মূর্তি : কবরে যাব না।

নেতা : আগে কথাটা ভালো করে শোন। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, শিক্ষিত ছেলে। চেষ্টা করলেই আমার কথা বুঝতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উঁচু ক্লাসে উঠেছ। অনেক কেতাব পড়েছ। তোমার মাথা আছে।

মূর্তি : ছিল। এখন নেই। খুলিই নেই। উড়ে গেছে। ভেতরে যা ছিল রাস্তায় ছিটকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

নেতা : জীবিত থাকতে তুমি দেশের আইন মানতে চাওনি। মরে গিয়ে তুমি এখন পরপারের কানুনকেও অবজ্ঞা করতে চাও। কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না। তোমার মতো ছেলেরা দেশের মরণ ডেকে আনবে। সকল সর্বনাশ না দেখে তুমি

বুঝি কবরে গিয়েও শান্ত থাকতে পারছ না। তোমাকে দেশের নামে, কওমের নামে, দীনের নামে, যারা এখনও মরেনি-তাদের নামে-মিনতি করছি–তুমি যাও, যাও, যাও !

মূর্তি : আমি বাঁচব।

নেতা : কী লাভ তোমার বেঁচে ? অশান্তি ডেকে আনা ছাড়া তোমার বেঁচে কী লাভ ? তুমি বেঁচে থাকলে বারবার দেশে আগুন জ্বলে উঠবে। সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার না করে সে আগুন নিভবে না। তার চেয়ে তুমি লক্ষ্মী ছেলের মতো কবরে চলে যাও। দেখবে, দুদিনে সব শান্ত হয়ে যাবে। দেশে সুখ ফিরে আসবে। (মূর্তি মাথা নাড়ে) আমি ওয়াদা করছি, তোমাদের দাবি অক্ষরে অক্ষরে আমরা মিটিয়ে দেব। তোমার নামে মনুমেন্ট গড়ে দেব। তোমার দাবি এ্যাসেম্বলিতে পাস করিয়ে নেব। দেশজোড়া তার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করব। যা বলবে তাই করব। দোহাই তোমার, তবু অমন স্তব্ধ পাথরের মূর্তির মতো, আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেক না। সরে যাও, চলে যাও, অদৃশ্য হয়ে যাও।

(সর্বাঙ্গে কাফনের কাপড় জড়াইয়া আর একটি মূর্তি নিঃশব্দে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। চুলে রক্ত মাখা। মুখে আঘাতের চিহ্ন। ঠোঁটের দুই পাশে বিশুষ্ক রক্তরেখা।)

কে ? তুমি কে ?

মূর্তি (২) : নাম বললে চিনতে পারবেন না। হাইকোর্টের কেরানি ছিলাম। তখন টের পাইনি। ফুসফুসের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছিল। এপিঠ-ওপিঠ। বোকা ডাক্তার খামোখা কেটেকুটে গুলিটা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে। জমাট রক্তের মধ্যে ফুটো নজরেই পড়েনি প্রথমে।

নেতা : তুমিও এই দলে এসে জুটেছ নাকি ?

মূর্তি (২) : গুলি দিয়ে গেঁথে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলেও আল্‌গা হতে পারব না।

নেতা : তুমি আমাকে চেন ?

মূর্তি (২) : চশমাটা আর খুঁজে পাইনি। অন্ধকারে আপনাকে চেনা যাচ্ছে না। তবে আপনার গলা চিনি।

নেতা : আমার কথা শুনেছ ? এইমাত্র যা বলছিলাম ?

মূর্তি (২) : আপনি মিথ্যেবাদী। কথা দিয়ে আপনি কথা রাখেন না। আপনি অনেক ওয়াদা করে সেবার আমাদের দেড় মাস লম্বা ধর্মঘট ভেঙে দিয়েছেন। আমার ছোট ছেলেটা তখন মারা যায়। আপনার কথা শুনেছি। আপনার কথা ভুলিনি। আপনি মিথ্যেবাদী।

মূর্তি : আমরা কবরে যাব না।

মূর্তি (২) : আমরা বাঁচব। *(বিড়বিড় করিতে করিতে পশ্চাতে গিয়া উপুড় হইয়া বসিবে। আর দেখা যাইবে না।)* *(নেতা মাথা নিচু করিয়া সরিয়া আসে। হাফিজ অগ্রসর হইয়া কানের কাছে বেশ জোরে ফিস্‌ফিস্ করিয়া)*

হাফিজ : হবে না। এ লাইনে ঠিক কাজ হবে না স্যার। অন্য রাস্তা ধরতে হবে। আমার মাথায় একটা প্লান এসেছে। দেখবেন ঠিক কাবু করে ফেলব। একটু ভোল বদলাতে হবে। সবই আমাদের করতে হয় স্যার। আপনি চুপ করে বসে দেখুন। *(হাফিজ চাদরটা খুলিয়া এক প্যাঁচ গায়ের উপর জড়াইয়া বাকি অংশ ঘোমটার মতো মাথার উপর তুলিয়া দিল।)*

নেতা : ঢং ছাড়। মেয়েলোকের মতো ঘোমটা দিয়েছ কেন ?

হাফিজ : *(ফিস্‌ফিস্ করিয়া)* চুপ ! আমি এখন স্ত্রীলোক। ঐ ছোকরার মা। কথা বলবেন না। দেখে যান। বুঝতে পারছেন না, সবাই একটু ঘোরের মধ্যে আছে, কিছু ধরতে পারবে না।

(আঁচল টানিয়া, ঘোমটা উঠাইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। কণ্ঠস্বরকে অনাবশ্যকভাবে স্ত্রীলোকের মতো করিয়া তুলিবার চেষ্টা নাই। তবে যথোপযুক্ত আবেগে ভরপুর।)

খোকা ! খোকা !

মূর্তি : *(চঞ্চল। বেদনাহত।)* কে ! কে ডাকে ?

হাফিজ : খোকা কোথায় গেলি তুই ? খো-কা !

মূর্তি : কে ? মা ? মা, তুমি কোথায় মা ? *(শূন্যে হাতড়ায়)*

হাফিজ : এই যে যাদু, আমি এইখানে।

মূর্তি : তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ, না মা ? তুমি বারণ করলে, তবু আমি শুনলাম না। রাস্তা থেকে ওরা ডাকল। আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম। তোমার কাছে বলতে গেলে পাছে তুমি বাধা দাও–সেই জন্যে তোমাকে কিছু না বলেই চুপে চুপে চলে গেছি। আজ যে ওরকম গোলমাল হবে তুমি আগে থেকে কী করে জানলে, মা ?

হাফিজ : মা হলে সব জানতে হয়। মা হলে জানতি, মার কষ্ট কী। মার বুক খালি হলে, মার কেমন লাগে, তুই দস্যু ছেলে বুঝবি না।

মূর্তি : তোমার সব কষ্ট বুঝি মা। নাক-মুখ বেয়ে আমার কেবল রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। সমস্ত দুনিয়াটা ঝাপসা হয়ে গেল। আমার তখন খালি কী মনে হচ্ছিল জান মা ? মনে হচ্ছিল তুমি বুঝি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছ। সেই সেবার টাইফয়েড জ্বরের ঘোরে যখন খালি প্রলাপ বকতাম, তখন যেমন আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে-ঠিক তেমনি। আর আমার নাক-মুখ গড়িয়ে তোমার চোখের গরম নোনা পানি কেবল ঝরছে– ঝরছে।

হাফিজ : তবু তো কোনো কথা শুনিস না। তোরা কেবল মা'র দুঃখ বাড়াতেই জন্মেছিস। এ তোদের কী নতুন নেশা ! এত মরণ-পাগল কেন তোরা ?

মূর্তি : মিছে কথা মা! আমরা কেউ মরতে চাইনি, মা। তোমার কাছে থাকতে কি আমার ইচ্ছে করে না ? হারিকেনের লণ্ঠন জ্বেলে অনেক রাত পর্যন্ত পড়ব। তেল কমে এলে সলতে উস্‌কে দিয়ে পড়ব, আর তুমি বারবার এসে বকবে–কেবল বকবে। তারপর লণ্ঠন জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবে। টেনে বিছানায় শুইয়ে দেবে। অন্ধকারে মশারির ফাঁক দিয়ে ছায়ামূর্তির মতো ঘুমে জড়ানো তোমার ছোট্ট এলোমেলো শরীর দেখব–দেখব মা, চলে যেও না-মা, তোমায় আমি দেখব–তোমায় আমি আদর করব মা। তুমি কোথায় মা ? মা !

হাফিজ : ঘুমের ঘোরে কী বকছিস। স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি ? অনেক রাত হয়েছে, লক্ষ্মী বাবা, আর রাত জেগে পড়ে কাজ নেই। বিছানা করে রেখেছি। যাদু আমার, শুতে যা।

মূর্তি : আমাকে শুতে যেতে বলছ মা ? না, না। আমি শোব না। আমি এখন শোব না, মা। আমি আর কোনোদিন শোব না। একবার ঘুমিয়ে পড়লে ওরা আমাকে আর জাগতে দেবে না। তুমি বুঝতে পারছ না মা–না, না, আমি শোব না। আমি যাব না। আমি থাকব। আমি উঠে আসব।

নেতা : ইন্সপেক্টর ! তোমার এই ভুতুড়ে নাটক আর কতক্ষণ চলবে ?

হাফিজ : ছিঃ বাবা, জিদ কর না। লক্ষ্মীটি, শুতে যাও। মার কথা শোন।

(দ্বিতীয় মূর্তি আচমকা চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়)

মূর্তি (২) : *(অস্পষ্টভাবে হাফিজের দিকে হাত বাড়াইয়া)* মিন্টু, মিন্টু। মিন্টু ঘুমায়নি এখনও ?

হাফিজ : (সুর পাল্টাইয়া) তোমার কোলে আসার জন্যে কাঁদছে।

মূর্তি (২) : দাও, আমার কোলে দাও। *(বাচ্চা কোলে লইবার ভঙ্গি করে)* ইস ! জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে গো !

নেতা : খবরদার! ফেলে দাও। ওটাকে ফেলে দাও কোল থেকে। এই শেষ বারের মতো বলছি, এখনও ভালো চাও তো সরে পড়। চলে যাও সব।

মূর্তি : আমি যাব না। আমি বাঁচব, মা। বৃষ্টিতে ভেজা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে আমি আরও হাঁটব, মা। ঠান্ডা রূপোর মতো পানি চিরে হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটব, মা।

মূর্তি (২) : কাঁদিসনে মিন্টু। তোর বাপ কি কম চেস্টা করেছে ? দুস্ট মুদি কিছুতেই মাসের শেষ বলে এক রত্তি বার্লি বাকি দিল না। বেতন নেই দেড় মাস, দেবে কেন ? তুই কাঁদিসনে মিন্টু। তুই কাঁদলে তোর মাও কেবল কাঁদবে। এখন চুপ করে ঘুমিয়ে থাক। দেখবি, কাল ভোরে সব জ্বর কোথায় চলে গেছে।

নেতা : সকাল পর্যন্ত তোমাদের নিয়ে এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নাকি ? না, আমি তা পারব না। এতসব আবদার আমার সঙ্গে চলবে না। গেট আউট, ডেভিল্‌স্ ! যাও বলছি।

হাফিজ : উত্তেজিত হবেন না স্যার। কুল্‌লি ! কুউল্‌লি !

মূর্তি : তুমি একটুও ভয় পেয়ো না। কিচ্ছু ভেবো না, মা। আমি কিছুতেই মরব না। ছায়ামূর্তির মতো বার বার আসব। তুমি যদি আমার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়, দরজায় এসে টোকা দেব। চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে তোমায় ইশারা করব। তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ব মা।

মূর্তি (২) : *(কোলের কল্পিত সন্তানকে)* দূর বোকা। তুই স্বপ্ন দেখছিস। ভয়ের কী আছে ? তুই তো আমার কোলে। আমি থাকতে তোকে মারে এমন দৈত্য দুনিয়ায় নেই। *(সামনের দিকে ইশারা করিয়া)* ওগুলো কিছু না। সব সং সেজে তোকে ভয় দেখাতে চায়। তুই ঘুমো। ঘুমো।

নেতা : ইন্সপেক্টর ! আমি এসব মানি না। আমি স-ব পুঁতে ফেলব। একটা একটা করে গুলি করে আমি সব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব। হাজার হাজার হাত মাটির নিচে সব পুঁতে ফেলব। যাতে কোনোদিন আর উঠতে না পারে। ভয় দেখাতে না পারে। গুলি, সবগুলোকে আবার গুলি কর। গার্ড ! গার্ড !

(হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করে মুর্দা ফকির।)

ফকির : জী হুজুর।

নেতা : *(লক্ষ না করিয়া)* গুলি কর।

ফকির : গুলি ! ওহ্ ! হ্যাঁ, আছে। আমার কাছে আরও কয়েকটা আছে। এই নিন বুলেট। খুব তাজা ! টাট্‌কা ! এখনও খুন লেগে রয়েছে। হাত পাতুন। ধরুন। *(স্তম্ভিত ভয়ার্ত বিমূঢ় নেতা হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিবে)* লোড আপনি করুন। আমি ওদেরকে ডেকে নিয়ে আসি। যাই। আমি মিছিলটা এই দিকে ডেকে নিয়ে আসি।

(হন্তদন্ত হইয়া ফকিরের প্রস্থান। সেই গমন পথের দিকে তাকাইয়া নেতা একবার নিজের বুক চাপিয়া ধরে। হাফিজ পিছন হইতে আগাইয়া তাহাকে ধরে।)

[নেপথ্যে মুর্দা ফকির চিৎকার করিতেছে : তোরা কোথায় গেলি ? সব ঘুমিয়ে নাকি ? উঠে আয়। তাড়াতাড়ি উঠে আয়। সব মিছিল করে উঠে আয়। গুলি। গুলি হবে। স্ফূর্তি করে উঠে আয় সব। কোথায় গেলি ? সব উঠে আয়। মিছিল করে আয় এদিকে। আজ গুলি? গুলি হবে আজ। কবর খালি করে সব উঠে আয়।]

(মঞ্চের উপরে লাল মূর্তিদ্বয় মুর্দা ফকিরের ডাক কান পাতিয়া শুনিতেছিল। ক্রমে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে একজনের পিছনে আরেকজন–ক্রমে আরও অনেকে–সারি দিয়া চলিয়া যাইবে এবং তাহাদের উপর প্রতিফলিত আলোর রেখাও ক্রমে বিলীন হইয়া যাইবে।)

(হাফিজ ও নেতা লক্ষ করে নাই যে মঞ্চ খালি হইয়া গিয়াছে।)

নেতা : *(বিবর্ণ মুখে)* ইন্সপেক্টর ! হার্টটা জানি কেমন করছে ! বড় ভয় পেয়ে গেছি ! একটু ধরে রেখো আমাকে। আর, আর একটু ঢেলে দিতে পারবে ?

হাফিজ : না। আপনার এখনও হুঁশ নেই। আমার নিজেরও হয়ত নেই। ঠিক বুঝতে পারছি না। *(পিছন হইতে গার্ড হঠাৎ লণ্ঠন হাতে ঢুকিয়া প্রচন্ড শব্দে বুট ঠুকিয়া স্যালুট করে।)*

নেতা : *(চমকাইয়া)* কে ! এটা কী আবার ?

হাফিজ : (দেখিয়া) ইডিয়ট ! এটা কি তোমার প্যারেড গ্রাউন্ড নাকি ? বন্দুকের গুলির মতো স্যালুট করতে শিখেছ দেখছি। কী চাও ?

গার্ড : গাড়িতে উইঠ্যা হগলে আপনাগো লাইগা এন্তেজার করতাছে। সব কাম খতম। কারফিউ শ্যাষ হইতেও আর দেরি নাই।

হাফিজ : *(প্রথম লক্ষ করিল যে, মঞ্চ খালি। ভালো করে কয়েকবার চোখ কচলায়)* গুড্! সব কাজ খতম তো ? গুড্ ! সব কাজ খতম স্যার। নিট জব। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি স্যার ? ভালো করে দেখুন না নিজেই।

নেতা : *(ধীরে ধীরে চোখ ঘুরাইয়া দেখে, তারপর সামনের দিকে অর্থহীন বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া চুপ করিয়া থাকে)* হুম্ !

গার্ড : কিছু তালাশ করতাছেন হুজুর ? খুঁইজা দেখুম ?

নেতা : না, চলো ।

হাফিজ : কিছু না স্যার। এসব কিছু না। গোরস্থানে এরকম কত কিছু হয়। তার ওপর আবার স্যার– মানে?

নেতা : হুম্। চলো। আর দেখো, মুর্দা ফকিরটাকে সঙ্গে নিতে হবে। কিছুদিন থাকুক। *(বুকে হাত চাপিয়া ধরে।)*

হাফিজ : এ্যা ? মুর্দা ফকির ? ওহ্ ! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ! ইয়েস্ স্যার। *(সকলে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে। গার্ড গ্লাস, বোতল ইত্যাদি গুছাইয়া লইবে।)*

অনুশীলনী

কবর

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অংশটুকু পড় এবং ১, ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নাটকে চরিত্রের পারস্পরিক কথোপকথনের মাধ্যমে ঘটনা গতি লাভ করে। সংলাপের মাধ্যমেই আমরা অতীত ঘটনা জানতে পারি এবং পরবর্তী ঘটনার জন্য প্রস্তুত হই। তা ছাড়া সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকটিত হয় চরিত্রের প্রকৃতি ও বিশিষ্টতা। এ দিক থেকে মুর্দা ফকিরের সংলাপের এ অংশটি তাৎপর্যপূর্ণ "এ মুর্দা কবরে থাকবে না। বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ হাত যত নিচেই মাটি চাপা দাও না কেন-এ মুর্দা থাকবে না, কবর ভেঙে বেরিয়ে চলে আসবে। উঠে আসবে।"

১. সংলাপ কী?
   ক. কোনো কিছুর বর্ণনা উপস্থাপন
   খ. পাত্র-পাত্রীর বাক-বিনিময়
   গ. বিশেষ উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করা
   ঘ. নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলা

২. সংলাপের অংশটিতে মুর্দা ফকিরের চরিত্রের নিম্নোক্ত পরিচয় পাওয়া যায়–
   i. বিদ্রোহের
   ii. উন্মাদের
   iii. বিপ্লবের

নিচের কোনটি সঠিক?
   ক. i
   খ. ii
   গ. i ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

৩. 'ঝড়ও বোঝে না, আগুনও বোঝে না।'– কে?
   ক. নেতা
   খ. হাফিজ
   গ. প্রথম মূর্তি
   ঘ. মুর্দাফকির

৪. 'ওরা মুর্দা নয়। মরেনি। মরবে না।' উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে–
   ক. শহীদদের হত্যার প্রতিবাদ
   খ. শহীদদের অমরত্বের কথা
   গ. শহীদদের প্রতি আবেগের প্রতিফলন
   ঘ. শহীদদের প্রতিবাদের প্রতিফলন

৫. 'মুর্দা ফকিরটাকে সঙ্গে নিতে হবে। কিছুদিন থাকুক।'– কিছুদিন থাকুক' বলতে নেতা কী বুঝিয়েছেন?
   ক. গোরস্থানের বাইরে অবস্থান
   খ. সংশোধনের সুযোগ দেওয়া
   গ. আটকাবস্থায় রেখে দেওয়া
   ঘ. কিছুদিন বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া।

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের অনুচ্ছেদটুকু পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হাফিজ : মেহেরবানি স্যার। পাকিস্তান হবার পর আমরা পেটি অফিসারেরাই কেবল কিছু পেলাম না। বৃটিশ আমলেও সমাজে মিশতে পারিনি। পাকিস্তানের জন্য এত ফাইট করে আমাদের এখনও সেই দশা। যদি আপনারা আমাদের দিকে ফিরে না তাকান আমরা বাঁচব কী করে। আমাদের তো কোনো রাজনীতি নেই স্যার। সরকারই মা-বাপ।

   ক. হাফিজ কে?
   খ. 'আমাদের এখনও সেই দশা' – ব্যাখ্যা কর।
   গ. 'সরকারই মা-বাপ!'– এ মন্তব্যের আলোকে চাটুকারদের পরিচয় দাও।
   ঘ. অনুচ্ছেদের আলোকে হাফিজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্লেষণ কর।

২. পুঁতে ফেল। দশ-পনের-বিশ-পঁচিশ হাত। একেবারে পাতাল পর্যন্ত খুঁড়তে বলে দাও। পাথর দিয়ে, মাটি দিয়ে, ভরাট করে গেঁথে ফেল। কোনোদিন যেন আর ওপরে উঠতে না পারে। কেউ যেন টেনে ওপরে তুলতে না পারে। যেন মিছিল করতে না পারে, স্লোগান তুলতে না পারে, যেন চ্যাঁচাতে ভুলে যায়।

   ক. উক্তিগুলো কার?
   খ. 'কোনোদিন যেন আর ওপরে উঠতে না পারে'– উক্তিটির মধ্য দিয়ে বক্তার কোন ধরনের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে ব্যাখ্যা কর।
   গ. অনুচ্ছেদের নেতিবাচক সংলাপের স্থলে ইতিবাচক সংলাপ প্রতিস্থাপন কর।
   ঘ. অনুচ্ছেদের আলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণ কর।